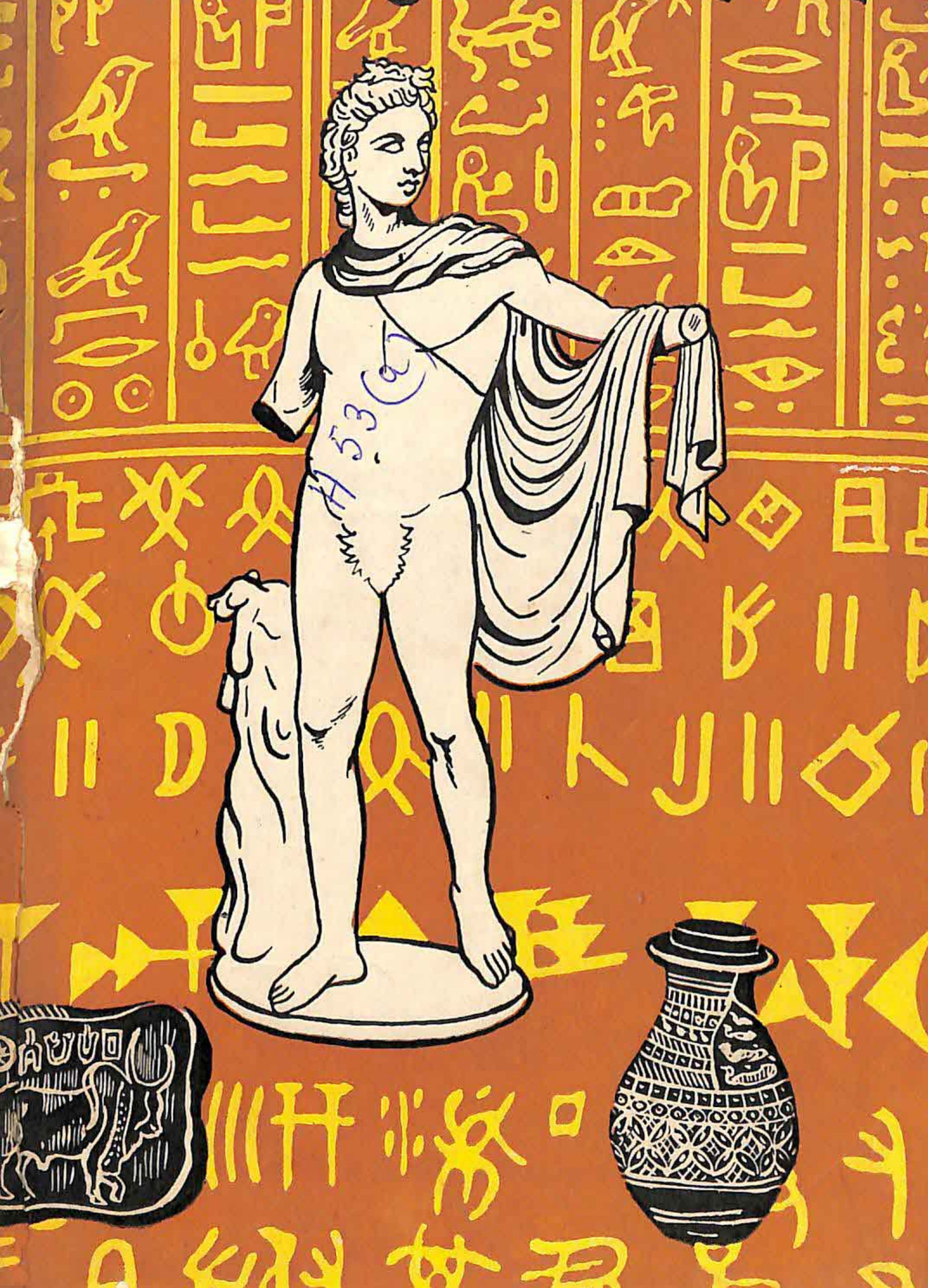
সভ্যতার ইতিহাস



Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI
(Vide T.B. No. VI/H/79/147 dated 14.12.79)

সভ্যতার ইতিহাস

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

শ্রীঅশোককুমার সরকার
অধ্যাপক, বহরমপুর গার্লস কলেজ

নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশক :
নির্মলকুমার সাহা
'নির্মল বুক এজেন্সী'
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭

ভারত সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত স্বল্প-মূল্যের কাগজে মুদ্রিত।

নির্মল বুক এজেন্সী
দশ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
'শ্রীহরি প্রেস'
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৭

সূচীপত্র

শিক্ষা, বুদ্ধের শিক্ষা, সাম্রাজ্যের কাহিনী, মৌর্য সাম্রাজ্য, কুষাণ সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, প্রাচীন বাংলার কাহিনী, বিদেশের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ, প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বিদেশীদের বিবরণ—মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, প্রাচীন ভারতের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিক্ষার অগ্রগতি—শিল্প ও স্থাপত্য, সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি।

HISTORY SYLLABUS

CLASS-VI

HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS :

A. (i) Why we should read history ; (to be acquainted with human civilisation, its development)

(ii) How we come to know of ancient people

B. Early Man.

Use of fire as early as 300,000 B.C. (by 'Peking man')
Food gathering man.

Old Stone Age :

Nature of tools and implements, their uses
New Stone Age : (By 8000 B. C.)
Evolution of tools and implements.
Man—a food producer.

The Neo-lithic revolution consisted also of domestication of animals : Invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling—stone houses with defences ; early transport beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts as evident from cave-paintings etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess of productivity.

(for 'B' as a whole)

C. Copper-Bronze Age :

Emergence of towns ; changes in production—specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state. Reasons of the growth of River-Valley Civilisations.

D. The Early Civilisations (3000 B. C.—1500 B. C.)—Mesopotamia, Egypt, Indus valley, China—in outlines :

(i) Mesopotamia :

(a) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas.

(b) Fertility of the soil, crops.

(c) Defence against floods.

(d) Other occupations.

(e) Achievements of Sumerians : imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script.

(ii) **Egypt :**

(a) Location and nature of the land :

(b) The Pharaoh, the priest, script and scribes tax collectors and 'soldiers' (workers) ;

(c) Trade ;

(d) The Pyramids (examples) ;

(e) Religious beliefs ;

(f) Chief occupations

(iii) **The Indus Valley :**

(a) The discoveries (brief reference to locations and findings);

(b) Town planning ;

(c) Food and other articles of use ;

(d) Crafts ;

(e) Trade ;

(f) Worship ;

(g) Light thrown by relics upon classification in society.

(iv) **China :**

(a) Valley of Huang Ho and Yangste-Kiang ;

(b) China in early times ;

(c) Myths (particularly of flood)

(v) Common features, in brief, of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life.

E. The Iron Age-Societies :

(a) Discovery and use of iron, its impact ;

(b) Main features of social and economic life ;

(c) Growth of kingship

I. (i) Babylon :

Farming and Commerce ; Temples and Priests ; Learning and Culture ; The code of Hamurabi—nature of society revealed by the code.

(ii) **Egypt as Imperial power :**

Colonies ; The power of priests

(iii) **Iran :**

Rise of Persia ; Zoroaster

(iv) **The Jews :**

Hebrews in Egypt ; Hebrew ; exodus under Moses—flight from slavery. (for 'I' as a whole)

II. **Greece (only in broad outlines) :**

An introductory note on the influence of Crete : The Homeric Age. The city state. Cultural interchange, colonisation.

Athens and Sparta—their social and political life.

Athens Vs. Sparta.

Cultural greatness of Athens ; Literature, Arts, Religion—brief reference to a few eminent persons e. g. Pericles, Sophocles. Socretes, Herodotus.

Macedon : Alexander—his invasion of India. Fall of the Empire. Roman conquest of Greece.

III. **Rome :**

Origin of Rome. Conflict with Carthage. Early Roman Society : Particians and Plebeians : Roman citizenship, Slavery and slave revolts (Spartacus).

Julius Caesar : End of Roman Republic New Empire, Eventual decline and fall ; Rise of Christianity.

IV. **China :**

"Great Shang". Confucius—his teachings. Building the Great Wall. The Chin Empire.

V. **India :**

(a) The coming of the Aryans. (b) The Vedas. (c) Early Aryan Society, religion, and political organisation (with reference to the Vedas), (d) The Epics. (e) The rise of Jainism and Buddhism. (f) The Empires—a brief outline of developments from the Mauryas—to the Kushans—to the decline of the Gupta Empire. (g) Ancient Bengal upto the decline of the Guptas (on the basis of proven historical materials viz inscriptions and literary evidence). (h) Foreign contacts (particularly with Central Asia)—their impact upon society and trade ; (i) Foreign Travellers--Megasthenes and Fa-Hien.--general picture of society as revealed in their accounts (in brief outlines only). (j) A brief summary of ancient Indian developments in arts and architecture, literature, education. (Taxila and Nalanda), and Sciences (Astronomy, Mathematics, Chemistry, Medicine).

প্রথম অধ্যায়

গোড়ার কথা

ইতিহাস কেন পড়িঃ মানুষের কথাই ইতিহাস। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের দরকার। এই খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি করতে হয়েছে। আবার খাদ্য-সংগ্রহের সুবিধার জন্য ও আত্মরক্ষার জন্য তাদের দলবদ্ধ হতে হয়েছে। দলবদ্ধ মানুষ মনের ভাব বোঝানোর জন্য মুখ থেকে যে শব্দ করতো তার থেকেই ভাষার উৎপত্তি।

দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হলে কতকগুলো নিয়মকানুন সকলকে মেনে চলতে হয়। এই নিয়মকানুন থেকেই প্রথমে সমাজ ও পরে রাষ্ট্রের সূচনা হয়। প্রাচীন যুগের মানুষ ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে ভয় করতো। এই ভয় থেকেই ভক্তি আর ভক্তি থেকেই ধর্মের শুরু।

দলবদ্ধ মানুষ ক্রমে খাদ্য উৎপাদন করতে শেখে। তারা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলে। খাদ্য-সংগ্রহের জন্য এখন আর সকলকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয় না। কিছু লোকের কাজ কমে যায়। তারা পায় অবসর। এই অবসর সময়ে তারা শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সৃষ্টি করে।

উৎপাদন-ব্যবস্থা, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম এবং শিল্প ও সাহিত্য নিয়েই গড়ে ওঠে সভ্যতা। যুগে যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সভ্যতারও পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিহাস থেকে মানুষের এই সভ্যতার কথাই আমরা জানতে পারি। যুগে যুগে এই সভ্যতার কিভাবে পরিবর্তন ঘটে ইতিহাসই আমাদের সেকথা বুঝিয়ে বলে।

প্রাচীন যুগের মানুষের কথা জানার উপায়ঃ অতি প্রাচীন যুগে মানুষ বাস করতো পর্বতের গুহায়। ইংল্যাণ্ড থেকে শুরু করে চীন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই এলাকায় এই রকম কতকগুলো গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গুহাগুলোর মধ্যে মানুষের মাথার খুলি ও হাড় পাওয়া গেছে। এই সব গুহার মধ্যে কিছু পাথরের যন্ত্রপাতিও পাওয়া গেছে। পণ্ডিতেরা এই সব মাথার খুলি, হাড় ও পাথরের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, সম্ভবতঃ চার থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে এই লোকগুলো পৃথিবীতে বাস করতো। এই সব

গুহায় যে সব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তার থেকে এই লোকগুলো সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা জানা যায়।

এই সমস্ত জিনিসপত্র পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এই লোকগুলো ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বাস করতো। এক দলের সাথে আর-এক দলের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। ছুরি, কুড়ুল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি এক এক এলাকায় ছিল এক এক রকমের। এর থেকে মনে করা হয় যে, এক অঞ্চলের লোকের সাথে আর-এক অঞ্চলের লোকের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। এইভাবে আমরা অতি প্রাচীন যুগের মানুষের কথা জানতে পারি।

প্রাচীন যুগের মানুষের কথা জানার জন্য পণ্ডিতদের চেষ্টার অন্ত নেই। তাঁরা পাহাড়ের গুহা থেকে প্রাচীন মানুষের চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। একই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় খননকার্য চালিয়েছেন। অনেক জায়গায় মাটির নিচে প্রাচীন মানুষের ব্যবহার করা অনেক জিনিস পাওয়া গেছে। খননকার্য চালিয়ে পণ্ডিতেরা মাটির নিচে অনেক শহর আবিষ্কার করেছেন। এই সব শহর নানা কারণে ধ্বংস হলেও এখানে সেই যুগের অনেক জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। কোন কোন শহরের রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। এখানে যে সব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তার থেকে তাদের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম প্রভৃতি অনেক বিষয় জানা যায়। এসব জায়গায় অনেক মূর্তি, ছবি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এর থেকে তাদের ধর্ম, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। অতি প্রাচীনকালে মানুষ লিখতে জানতো না। ফলে, এইসব জিনিসপত্র ছাড়া তাদের সম্বন্ধে জানার অন্য কোন উপায় নেই। প্রাচীন যুগের কিছু কিছু লোক পরে লিখতে শেখে। তাদের লেখা সীলমোহর প্রভৃতি পাওয়া গেছে। কিন্তু ঐ লেখা এখনো পড়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং তাদের বিষয়ও আমরা ঐ সব জিনিসপত্র থেকেই জানতে পারি।

শিলালিপি, মুদ্রা এবং প্রাচীন অট্টালিকা, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি থেকেও আমরা প্রাচীন যুগের কথা জানতে পারি। এগুলিকে ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বলে। অনেক ক্ষেত্রেই শিলালিপি-

গুলি খোদাই করিয়েছেন সেই যুগের লোক। সুতরাং সেই বিবরণ নির্ভরযোগ্য। পাথরে খোদাই করা বলে এগুলোর পরিবর্তন সম্ভব নয়। পাথরে ছাড়াও পোড়ামাটি, তাম্রফলক প্রভৃতিতে লিপি খোদাই করা হ'তো। মুদ্রা থেকেও প্রাচীন যুগের অনেক কথা জানা যায়। মুদ্রায় রাজার নাম ও তারিখ থাকে। সুতরাং মুদ্রা প্রাচীন ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান। প্রাচীন অট্টালিকা, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি থেকেও আমরা প্রাচীন যুগের শিল্প, জীবনযাত্রা ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে জানতে পারি।

প্রাচীন যুগের লেখা বই থেকেও আমরা প্রাচীন যুগের অনেক কথা জানতে পারি। ধর্মগ্রন্থ থেকে সেই যুগের ধর্ম ও সমাজের কথা জানা যায়। প্রাচীনকালে কিছু কিছু ইতিহাসের বইও লেখা হয়েছে। এ ছাড়া প্রাচীন মহাকাব্য প্রভৃতি থেকেও প্রাচীন যুগের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি।

সুতরাং পাহাড়ের গুহায় পাওয়া কিছু কিছু জিনিসপত্র, খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ ও জিনিসপত্র এবং প্রাচীনকালের শিলালিপি, মুদ্রা ও গ্রন্থ থেকে আমরা প্রাচীন যুগের মানুষের কথা জানতে পারি।

অনুশীলনী

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। আমরা ইতিহাস কেন পড়ি?

২। কি কি উপায়ে প্রাচীনকালের মানুষের কথা জানা যায়?

(খ) অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। মানুষ কেন যন্ত্রপাতি তৈরি করে?

২। কিভাবে ভাষার উৎপত্তি হয়?

৩। কিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সূচনা হয়?

৪। সবচেয়ে প্রাচীনকালের লোক কতদিন আগে পৃথিবীতে বাস করতো? কিভাবে তাদের সম্বন্ধে জানা যায়?

৫। সবচেয়ে প্রাচীনকালের লোকদের সম্বন্ধে কি জান?

৬। পণ্ডিতেরা নানা জায়গায় কেন খননকার্য চালান?

৭। খননকার্যের ফলে কি কি পাওয়া গেছে?

(গ) শূন্যস্থান পূরণ কর:

১। দলবদ্ধ মানুষ মনের ভাব বোঝানোর জন্য মুখ থেকে যে শব্দ করতো তার থেকেই —— উৎপত্তি।

২। প্রাচীন যুগের মানুষ ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে ভয় করতো। এই ভয় থেকেই —— আর —— থেকেই —— শুরু।

৩। অতি প্রাচীনকালে মানুষ বাস করতো পর্বতের ——।

৪। অনেক জায়গায়ই প্রাচীনকালের লোকের প্রথম লেখা বই ——।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম যুগ

আদিম যুগের মানুষ : অতি প্রাচীনকালে মানুষ বাস করতো পর্বতের গুহায়। চীন, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশে পাহাড়ের গুহায় মানুষের মাথার খুলি, হাড় ও পাথরের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। চীনে পিকিং-এর কাছে এক গুহায় একটা মানুষের মাথার খুলি, কিছু পাথরের যন্ত্রপাতি ও কিছু অতি প্রাচীন যুগের জন্তুর হাড় পাওয়া গেছে। পিকিং-এর কাছে গুহায় যে মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে, পণ্ডিতেরা তার নাম দিয়েছেন 'পিকিং মানুষ'। 'পিকিং মানুষের' গুহায় আগুনের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এর থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই যুগের মানুষ আগুনের ব্যবহার জানতো। আজ থেকে তিন লক্ষ বা চার লক্ষ বছর আগে 'পিকিং মানুষ' পৃথিবীতে বাস করতো।

আমরা যাকে আদিম যুগ বলি তা চলেছিল কয়েক লক্ষ বছর। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যে-সব মানুষ বাস করতো, তাদের সকলকেই আদিম যুগের মানুষ বলা চলে।

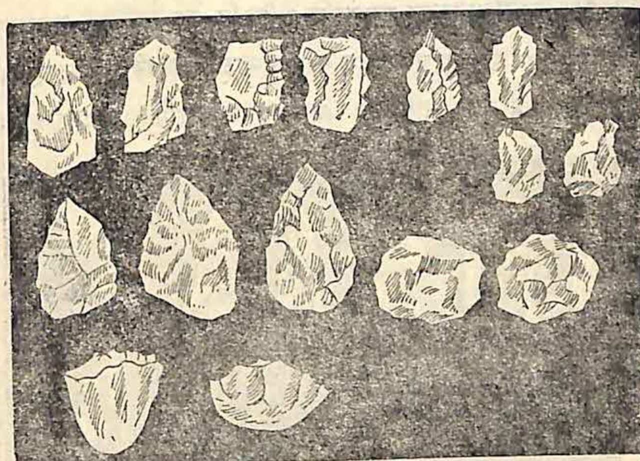
এই যুগের লোক খাদ্য উৎপাদন করতে জানতো না। চাষ-বাস করতে বা পশুপালন করতেও তারা শেখেনি। তারা খেতো বনের ফলমূল আর জন্তু-জানোয়ারের মাংস। এই সব জন্তু-জানোয়ার তারা নানা উপায়ে শিকার করতো। যে-দিন যে শিকার জুটতো, তাই-ই তারা খেতো। শিকার করা না গেলে বা ফলমূল না পাওয়া গেলে, তাদের উপোস করতে হ'তো। এইজন্য তাদের বলা হয় খাদ্য-সংগ্রাহক মানুষ।

শিকার করা বা ফলমূল সংগ্রহ করার জন্য তারা কিছু কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি করতো। খাদ্য-সংগ্রহের নিশ্চয়তা না থাকায় তারা পোকা-মাকড়, জন্তু-জানোয়ার যা পেতো প্রায় সবই খেতো। যেদিন বড় শিকার জুটতো সেদিন হ'তো তাদের ভোজ। যেদিন শিকার না জুটতো সেদিন হ'তো উপবাস।

পুরাতন প্রস্তর যুগ—এই যুগের যন্ত্রপাতি : অতি প্রাচীনকালে মানুষ পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতো। তখনো তারা ধাতুর ব্যবহার শেখেনি। সেইজন্য এই যুগের নাম ছিল 'প্রস্তর যুগ'।

প্রস্তর যুগকে আবার দু' ভাগে ভাগ করা হয়—পুরাতন প্রস্তর যুগ আর নতুন প্রস্তর যুগ। আদিম যুগের মানুষ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতো। এইজন্য এই যুগকে 'পুরাতন প্রস্তর যুগ' বলে।

এই যুগের মানুষই প্রথম আগুনের ব্যবহার শেখে। আগ্নেয়গিরির আগুন, দাবানল বা বজ্রপাতের আগুন থেকে এবং বিশেষ ধরনের পাথরের টুকরো ঘষলে যে আগুন বের হয় তার থেকেই মানুষ আগুন জ্বালা শেখে। আগুনের সাহায্যে আলো জ্বেলে মানুষ অন্ধকার দূর করে। আগুনের উত্তাপে সে শীতের হাত থেকে রক্ষা পায় আর বন্য পশুদের ভয় দেখিয়ে তাড়ায়। মানুষ আগুনের সাহায্যে রান্না করতে শেখে। এই আগুনের সাহায্যেই মানুষ পরে ধাতু গলাতে সক্ষম হয়। তারা খাদ্য-উৎপাদন করতে শেখেনি। ফলমূল সংগ্রহ করে এবং জন্তু-জানোয়ার শিকার করেই তারা জীবন-ধারণ করতো। ফলমূল সংগ্রহ ও শিকারের জন্য কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। পুরাতন প্রস্তর যুগের প্রথম দিকে মানুষ দু' সের,



পুরাতন প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি

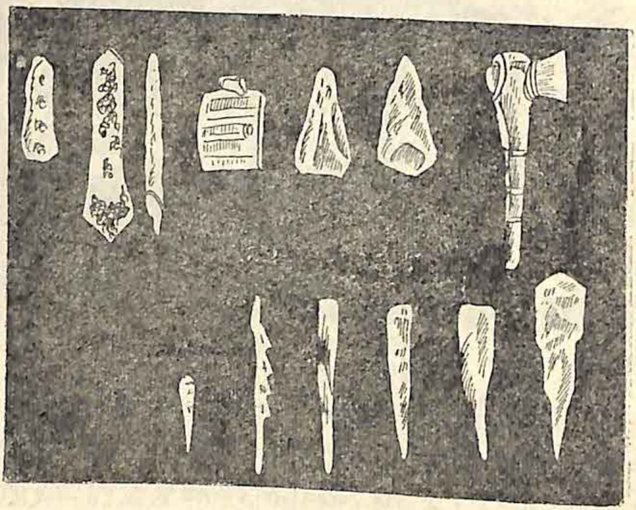
আড়াই সের ওজনের পাথরের টুকরোর পাশগুলো ভেঙে ধারালো করে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতো। মানুষ তখনো নানা কাজের জন্য নানা যন্ত্র তৈরি করতে শেখেনি। একই যন্ত্রের সাহায্যে তারা নানা কাজ করতো। এই ধরনের যন্ত্রকে 'হাতকুড়ুল' বলা হয়।

পুরাতন প্রস্তর যুগের মাঝামাঝি সময়ে পাথরের টুকরো থেকে অংশ ভেঙে নিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি করা হ'তো। এই সময়ে নানা কাজের জন্য নানা ধরনের যন্ত্রপাতিও তৈরি করা হ'তো।

পুরাতন প্রস্তর যুগের শেষের দিকে মানুষ হাড় ও হাতির দাঁতের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শেখে। এই সময়ে নতুন নতুন পাথরের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিও তৈরি হয়। এই যুগের মানুষ ছাল-ছাড়ানোর যন্ত্রপাতি ও সূঁচও তৈরি করতে জানতো। ক্রমে তারা বঁড়শী ও বর্শার ব্যবহার শেখে। সম্ভবতঃ এই সময়ে তারা তীর-ধনুকও ব্যবহার করতো। কোন কোন গুহায় এই যুগের মানুষের আঁকা জন্তু-জানোয়ারের ছবি পাওয়া গেছে। পুরাতন প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতির উন্নতি এক নতুন যুগের সূচনা করে। এই যুগের নাম 'নতুন প্রস্তর যুগ'।

নতুন প্রস্তর যুগ—এই যুগের যন্ত্রপাতির উন্নতি : পুরাতন প্রস্তর যুগের প্রথম দিকে পাথরের যন্ত্রপাতিগুলো ছিল অমসৃণ। কিন্তু এই যুগের শেষের দিকে যন্ত্রপাতিগুলোর উন্নতি হয়। এই সময়ে পাথরের মসৃণ যন্ত্রপাতি তৈরি হতে আরম্ভ করে। নানা কাজের জন্য নানা ধরনের যন্ত্রপাতিও তৈরি হয়। এই সময়ে ধীরে ধীরে পুরাতন প্রস্তর যুগের শেষ হয় ও নতুন প্রস্তর যুগের সূচনা হয়।

যে যুগে মানুষ পাথরের মসৃণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে



নতুন প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি

আরম্ভ করে তাকেই সাধারণতঃ 'নতুন প্রস্তর যুগ' বলা হয়। আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে এই যুগের সূচনা হয়।

খননকার্যের ফলে পৃথিবীর নানা জায়গায় এই যুগের নানা ধরনের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। এইগুলোর মধ্যে আছে কপিকলের চাকা, শান দেবার পাথর, সাঁড়াশি, নিড়ানি, মই, বাটালি, টাকু, তাঁত, কাস্তে, করাত প্রভৃতি। এই যুগের একটা পাথরে খোদাই-করা ছবিতে দেখা যায় যে, একটা লোক দুটো বলদে-টানা লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করছে। এই যুগের মানুষের আর একটি বড় আবিষ্কার চক্র বা চাকা। এই যুগের মানুষ পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করতেও শেখে।

খাদ্য-উৎপাদন: পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করতো। তারা খাদ্য উৎপাদন করতে জানতো না। কিন্তু পুরাতন প্রস্তর যুগের শেষে মানুষ ধীরে ধীরে কৃষিকার্য শেখে। পুরাতন প্রস্তর যুগে পুরুষরা যখন শিকারে বের হ'তো, মেয়েরা তখন ফলমূল ও বুনো ঘাসের বীজ সংগ্রহ করতো। কালক্রমে তারা ঐ ঘাসের বীজগুলো মাটিতে পুঁতে তার থেকে ফসল ফলাতে আরম্ভ করে।

ফসলের পরিমাণ বাড়াবার জন্য তারা জমি চাষ করে বীজ বুনতে আরম্ভ করে এবং জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলতে শেখে। এই-ভাবে নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে আরম্ভ করে। খাদ্য-সংগ্রাহক মানুষ খাদ্য-উৎপাদকে পরিণত হয়। এই যুগের লোকেরা চাষ করে গম ভুট্টা, ছোলা, যব প্রভৃতি উৎপাদন করতো।

এই যুগে ফসল জমিয়ে রাখার জন্য শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হ'তো। পুরাতন প্রস্তর যুগে খাবার পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কোন কারণে বনে বেশী ফলমূল না পাওয়া গেলে বা শিকার না পাওয়া গেলে মানুষকে উপোস করতে হ'তো। খাবার বেশী পাওয়া যেতো না বলে মানুষের সংখ্যাও ছিল কম। কিন্তু মানুষ যখন কৃষিকার্য শিখলো তখন অনেক বেশী খাবার পাওয়া যেতো। এই খাবার সারা বছরের জন্য জমিয়ে রাখা হ'তো। সুতরাং খাদ্যাভাব কমে গেলো। ফলে, মানুষের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেলো।

নতুন প্রস্তর যুগে পশুপালন, পোড়ামাটির পাত্রনির্মাণ ও বস্ত্রবয়ন: নতুন প্রস্তর যুগে মানুষ পশুপালন করতে শেখে।

কুকুরই সর্বপ্রথম পোষমানা পশু। তারপর মানুষ ধীরে ধীরে ছাগল, ভেড়া, শূকর ও গরুকে পোষ মানায়। সবশেষে পোষ মানে ঘোড়া। এই সব পশুর মাংস তারা খেতো। এদের চামড়া তারা নানা কাজে লাগাতো। আর এই সব জন্তু তাদের বোঝা বইতো। গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যও ছিল তাদের খাদ্য। কৃষিকার্যের মত পশুপালনও মানুষের খাদ্যের অভাব অনেকটা দূর করলো।

এই যুগের মানুষ সর্বপ্রথম পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করতে শেখে। প্রথম দিকে সম্ভবতঃ তারা হাত দিয়েই নানা ধরনের মাটির পাত্র তৈরি করতো। এই মাটির পাত্রে কিছু কিছু কারুকার্যও করা হ'তো। পরে অবশ্য কুমোরের চাকার সাহায্যে উন্নত ধরনের পাত্র তৈরি করা হয়।

এই যুগের আর একটি আবিষ্কার বস্ত্রবয়ন। ভেড়ার লোম এবং কোন কোন গাছের বা তার ফলের আঁশ থেকে তারা সূতো কেটে কাপড় বুনতে আরম্ভ করে। এই যুগের মানুষ সূতো কেটে কাপড় বোনার জন্য টাকু ও তাঁত আবিষ্কার করে। লতাপাতার রস দিয়ে তারা এই কাপড় রং করতো। নতুন প্রস্তর যুগের এই সব আবিষ্কারকে সভ্যতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে।

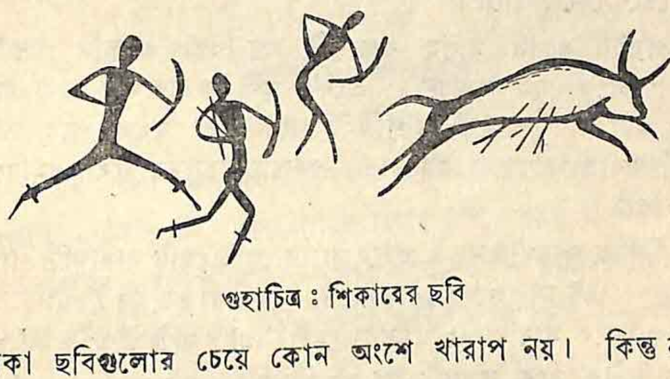
গৃহনির্মাণ, যাতায়াত-ব্যবস্থা ও সমাজ-জীবনের সূত্রপাত : পুরাতন প্রস্তর যুগের লোক বাড়ি তৈরি করতে জানতো না। তারা বাস করতো গুহায়। কিন্তু নতুন প্রস্তর যুগের লোক বাড়ি তৈরি করে বাস করতো। বিভিন্ন জায়গায় এই যুগের কয়েকটি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এখানে কাঠ, পাথর প্রভৃতি দিয়ে বাড়ি তৈরি করা হ'তো। বেশ বড় এলাকা নিয়ে এই গ্রামগুলো গড়ে উঠেছিল। এই গ্রামগুলোকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করা হ'তো এবং পাথরে-গড়া দুর্গ বা রক্ষা-ব্যবস্থাও থাকতো। বাড়ি করার জন্য মই, কপিকল প্রভৃতি দরকার। এগুলিও এই যুগের মানুষ তৈরি করতে জানতো।

নতুন প্রস্তর যুগে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মাল বয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ছিল। কপিকল, চাকা প্রভৃতির সাহায্যে বাড়ি

তৈরির মাল-মসলা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় বয়ে আনা হ'তো। এইভাবে পাথর বয়ে এনে গ্রামের বাড়ি, দুর্গ প্রভৃতি তৈরি করা হ'তো। এই যুগের লোকেরা সাল্‌তি জাতীয় নৌকা তৈরি করতে জানতো। আর এই নৌকায় করে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। পাহাড়-পর্বত পার হয়ে দূরবর্তী অঞ্চলের সাথেও তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। এই যুগের এক-একটা গ্রাম থেকে অনেক দূরবর্তী অঞ্চলের বহু জিনিসপত্রও পাওয়া গেছে। এই যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য হ'তো বিনিময় প্রথায়। যে জিনিস তাদের বেশী ছিল সেই জিনিসের বদলে তারা অন্য এলাকা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতো।

পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষকে খাবারের সন্ধানে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ঘুরে বেড়াতে হ'তো। কিন্তু নতুন প্রস্তর যুগে মানুষ কৃষিকার্য, পশুপালন, বস্ত্রবয়ন, পাত্রনির্মাণ ও ঘরবাড়ি তৈরি করতে শেখে। খাবারের সন্ধানে আর তাদের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হয় না। সুতরাং তারা এক-একটা গ্রামে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এইভাবে শুরু হয় সমাজ-জীবন।

শিল্পকলা ও ধর্মবিশ্বাস ঃ পুরাতন প্রস্তর যুগের গুহার দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি পাওয়া গেছে। এই ছবিগুলো আজকের দিনে



গুহাচিত্র ঃ শিকারের ছবি

আঁকা ছবিগুলোর চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। কিন্তু নতুন প্রস্তর যুগে মাটির পাত্রে কারুকার্য ছাড়া এরকম আর কোন চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া যায় না। নানা জায়গায় নতুন প্রস্তর যুগের পাথরের সমাধি-কক্ষ, এক-পাথরের স্তম্ভ প্রভৃতি পাওয়া গেছে। অনেকে মনে করেন এগুলি সব মন্দির ও

বেদীর ধ্বংসাবশেষ। পাথরে খোদিত কিছু কিছু চিত্রে এই যুগের সমাজ-জীবনের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই যুগের মানুষ তাদের মৃতদেহগুলো কবর দিত। কোথাও কোথাও কবরখানা থাকতো; কোথাও কোথাও মৃত ব্যক্তির বাড়ির পাশেই তাকে কবর দেওয়া হ'তো। এই যুগের লোক জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করতো। কোন কোন জায়গায় এই যুগের কবচ পাওয়া গেছে। কোথাও কোথাও খুব ছোট ছোট পাথরের কুড়াল পাওয়া গেছে। এইগুলোয় ফুটো থাকতো। এই কুড়ালগুলো হারের সাথে লাগিয়ে গলায় পরা হ'তো।

ভাষার সূচনা—ফসলের দেবীর আরাধনা : জন্তু-জানোয়াররা বিশেষ বিশেষ শব্দ করে ভাব প্রকাশ করে। মানুষও সম্ভবতঃ প্রথমে এইভাবে শব্দ করতো। কালক্রমে মানুষ ইশারায় মনের ভাব প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু মানুষ যখন কৃষিকার্য আরম্ভ করে, পশুপালন করতে শেখে এবং তাঁত, কপিকল, চাকা প্রভৃতি জটিল যন্ত্র তৈরি করতে শেখে, তখন মনের ভাব প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনেক বৃদ্ধি পায়। এই সব কাজের জন্য অনেক লোককে একসাথে কাজ করতে হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে ভাব প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। একারণে এই যুগে ভাষার বিকাশ ঘটে। ভাষার সাহায্যেই মানুষ তার জ্ঞান তার বংশধরদের জন্য রেখে যেতে পারে।

প্রাচীন যুগের মানুষ ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রকৃতির লক্ষণগুলিকে ভয় করতো। এদের খুশী করার জন্য তারা এদের পূজা করতো। আবার যে পৃথিবী থেকে তারা ফসল পায় তাকে তারা দেবীরূপে কল্পনা করতো। এইভাবে তাদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

বিভিন্ন জায়গায় নতুন প্রস্তর যুগের ছোট ছোট নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলো পোড়ামাটি, পাথর বা হাড়ের তৈরী। এই মূর্তিগুলোকে সাধারণতঃ 'মাতৃকা-দেবীর' মূর্তি বলে মনে করা হয়। যে পৃথিবীর বুকে ফসল ফলে তাকে নারী বলে কল্পনা করা হ'তো। এই নারী বা পৃথিবীকে প্রার্থনা ও পূজার দ্বারা খুশী করা হ'তো। মন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারাও পৃথিবীতে বেশী ফসল ফলানো সম্ভব বলে তারা মনে করতো। এর থেকে মনে হয় এই যুগের লোক পৃথিবীকে 'ফসলের দেবী' বলে পূজা করতো।

অনুশীলনী

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। আদিম যুগের মানুষ সম্বন্ধে কি জান ?

২। পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কি জান ?

৩। নতুন প্রস্তর যুগে মানুষ কিভাবে খাদ্য উৎপাদন করতো ? তারা কি কি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতো ?

৪। নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ কিভাবে বাড়ি তৈরি করতো ? তাদের যাতায়াত-ব্যবস্থা কেমন ছিল ?

৫। নতুন প্রস্তর যুগের মানুষের শিল্পকলা ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কি জান ?

(খ) অল্প কথায় উত্তর দাও ঃ

১। 'পিকিং মানুষ' সম্বন্ধে কি জান ?

২। 'নতুন প্রস্তর যুগ' কাকে বলে ?

৩। নতুন প্রস্তর যুগে কিভাবে সমাজ-জীবন আরম্ভ হয় ?

(গ) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। কোন্ যুগের লোক প্রথমে আগুনের ব্যবহার শেখে ?

২। পুরাতন প্রস্তর যুগের লোকেরা যে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের নানা কাজ করতো, তাকে কি বলা হয় ?

৩। কোন্ জন্তু সর্বপ্রথম মানুষের কাছে পোষ মানে ?

৪। নতুন প্রস্তর যুগে কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য হ'তো ?

৫। নতুন প্রস্তর যুগে কিভাবে মৃতদেহের সৎকার করা হ'তো ?

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ

শহর গড়া, উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন, বিশেষ কারিগরী বিদ্যা ঃ নতুন প্রস্তর যুগের লোকে গ্রামে বাস করতো। চাষ-বাসই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। লোকসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে নতুন চাষের জমি দরকার। নতুন চাষের জমির দখল নিয়ে এক এলাকার লোকের সাথে আর-এক এলাকার লোকের প্রায়ই বিবাদ বাধতো। তা ছাড়া বন্যা, খরা প্রভৃতির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো। অতিরিক্ত ফসল জমানো থাকতো না বলে সমাজে বিপদ দেখা দিতো। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার উপায় ছিল শহর গড়ে তোলা।

পাঁচিল-ঘেরা শহরে শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল কম। সেজন্য অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করে শহরে এনে জমিয়ে রাখা যেতো।

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগেই শহর গড়ে ওঠে। আজ থেকে ছ'হাজার বছর আগে মানুষ তামার ব্যবহার শেখে। প্রথমে তামাকে গরম করে পিটিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি করা হ'তো। পরে তামাকে গলিয়ে ছাঁচে ফেলে নানারকম যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হয়। কিন্তু তামা ছিল নরম ধাতু। নতুন যন্ত্রপাতিগুলোকে আরও শক্ত করার দরকার দেখা দিল। এই সময়ে তামার সাথে টিন মিশিয়ে এক মিশ্র ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হ'লো। এই নতুন ধাতুর নাম ব্রোঞ্জ। তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতির বহুল প্রচলনের সাথে সাথে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সূচনা হয়।

এই সময় কয়েকটি আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন দেখা দেয়। এতদিন কৃষিকার্য নির্ভর করতো প্রকৃতির দয়ার উপর। ভাল বৃষ্টি না হলে ফসল ভাল হ'তো না। নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলেও ভাল ফসল হ'তো না। এই সময় থেকে নদীতে খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। জলসেচের ফলে খরায় বা নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে ফসল না হবার ভয় থাকে না। ফসলের পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বড় বড় নদীর ধারেই শহরগুলো গড়ে ওঠে।

এই যুগে মানুষ গৃহপালিত জন্তুর শক্তিকে কাজে লাগাতে শেখে। লাঙ্গল টানা ছাড়াও গৃহপালিত জন্তুকে ভারবহনের কাজে লাগানো হয়। এই যুগে চাকার প্রচলনের ফলে যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। গৃহপালিত জন্তুতে টানা চাকা-লাগানো গাড়ির ব্যবহার আরম্ভ হয়। কুমোরের চাকার প্রচলনও এই সময়ে বৃদ্ধি পায়।

ধাতুর কাজ করতে হলে বিশেষ কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজন। চাষ-বাসের ফাঁকে ফাঁকে ধাতুর কাজ করা চলে না। এর ফলে ধীরে ধীরে এমন একটা শ্রেণী গড়ে উঠলো, যারা শুধু ধাতুর কাজই করতো।

যারা কুমোরের চাকার সাহায্যে মাটির পাত্র তৈরি করতো, তারাও আস্তে আস্তে একটা শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই কাজ করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। সুতরাং সকলের পক্ষে এই কাজ

করা সম্ভব ছিল না। এইভাবে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

ধাতু, পাথর প্রভৃতি জিনিস অনেক সময়ে কাছাকাছি জায়গায় পাওয়া যেতো না। দূরবর্তী অঞ্চল থেকে এইগুলো বয়ে আনার জন্য প্রথমে গরু, গাধা, উট প্রভৃতি জন্তু ব্যবহার করা হ'তো। পরে এই সমস্ত জন্তুর সাহায্যে চাকা-লাগানো গাড়িতে এই জিনিসগুলো বয়ে আনা হ'তো। এই সময় জলপথেও দূর দেশ থেকে নানা জিনিস বয়ে আনা হ'তো। পালতোলা নৌকাও এই যুগে আবিষ্কৃত হয়। যারা নৌকা, গাড়ি প্রভৃতি তৈরি করতো তাদেরও বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তারাও এক নতুন কারিগর শ্রেণীতে পরিণত হয়।

বাণিজ্য ও সমাজ-জীবনে পরিবর্তন: তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। জলপথেই প্রধানতঃ এই বাণিজ্য চলে। মিশর থেকে আরম্ভ করে হিমালয় পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বড় বড় নদীর কূলে এই যুগের সভ্যতাগুলো গড়ে ওঠে। পার্বত্য এলাকা থেকে খনিজ পদার্থ, বনাঞ্চল থেকে কাঠ প্রভৃতি আমদানি করা এই সময়ে প্রয়োজন হয়ে ওঠে। সুদূর ভারতের সিন্ধু-উপত্যকা হতেও এই সময়ে অনেক জিনিস আমদানি করা হ'তো। এই সময় পর্যন্ত মুদ্রার প্রচলন হয় নাই। সুতরাং বিনিময়-প্রথার মাধ্যমেই বাণিজ্য চলতো।

সেচের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি, ধাতুর প্রচলন, যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতি ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সমাজেও পরিবর্তন দেখা দেয়। যুদ্ধ-বন্দীদের এই সময়ে দাসে পরিণত করা হয়। এতদিন পর্যন্ত ফসল, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি সকলের সম্পত্তি ছিল। এই সময় থেকে এগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

যুদ্ধের সময় যারা নেতৃত্ব করতো তারা দাস, গৃহপালিত জন্তু প্রভৃতি বেশী করে নিজেদের অধিকারে রাখতো। এই সম্পত্তি তাদের সন্তানরা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করতো। সুতরাং সম্পত্তি ও ক্ষমতা ক্রমে বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়।

এই যুগে বিজ্ঞানের সূচনা হলেও তার বেশী উন্নতি হয় নাই। জমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য কিছু কিছু অনুষ্ঠান করা হ'তো। প্রথম দিকে সব লোকই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতো। কাল-ক্রমে এক শ্রেণীর বিশেষ লোকের হাতে এই অনুষ্ঠানের ভার পড়ে। তারা ছিল এই অনুষ্ঠান পরিচালনার বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। ক্রমে তারা এই অনুষ্ঠানগুলোকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। তারা আর কোন কাজ করতো না। এইভাবে তারা এক বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই শ্রেণীকে 'পুরোহিত-শ্রেণী' বলা চলে।

সুতরাং তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ-জীবনেও পরিবর্তন দেখা দেয়। বিশেষ কারিগর শ্রেণী, ক্ষমতা ও সম্পত্তির অধিকারী যুদ্ধ-নায়ক ও পুরোহিত প্রভৃতি শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রের সূচনা: এই যুগে এক দলের সাথে আর-এক দলের যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। এই যুদ্ধ চালানোর দায়িত্ব যারা গ্রহণ করতো তারা খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতো। যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য তাদের ভাগেই বেশী পড়তো। যুদ্ধ-বন্দীদের এই সময়ে দাসে পরিণত করা হ'তো। এই দাসদের দিয়ে নানারকম কাজ করিয়ে নেওয়া হ'তো। এই সময়ে এমন এক শ্রেণীর লোক দেখা দিল যারা নিজেরা কোন কাজ করতো না। অধিকাংশ জমি, যন্ত্রপাতি আর দাস ছিল তাদের অধিকারে। সুতরাং সমাজ বিশেষভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক ভাগে থাকে সম্পত্তি ও দাসের অধিকারী—যারা কিছু কাজ করতো না। আর-এক ভাগে থাকে যাদের অল্প জমি ও কিছু কিছু যন্ত্রপাতি থাকতো এবং যাদের কোন জমি ও যন্ত্রপাতিও ছিল না—যারা শুধু প্রভুদের জন্যই কাজ করতো।

যারা এই সব সম্পত্তি ও দাসের মালিক তারা অন্য সকলকে তাদের অধীনে রাখার চেষ্টা করতো। এই উদ্দেশ্যে তারা কিছু কিছু নিয়মকানুন রচনা করে ও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরে সৈন্যবাহিনী, জেলখানা, বিচারালয় প্রভৃতিতে পরিণত হয়। এইভাবে এই যুগে রাষ্ট্রের সূচনা হয়।

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা নদীর তীরে গড়ে উঠলো কেন ঃ এই যুগের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদীর তীরে। নীলনদের কূলে মিশরে, টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর কূলে মেসোপটেমিয়ায়, সিন্ধুনদের কূলে পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে এই যুগের শহরগুলো গড়ে ওঠে। যেখানে খাদ্য-উৎপাদনের নিশ্চয়তা থাকে না, সেখানে বড় বড় শহর গড়ে উঠতে পারে না। প্রতি বৎসর বন্যার ফলে নদীর দুই তীরের জমি উর্বর হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এই সময়ে নদী থেকে খাল কেটে সেচের সাহায্যে ফসলের ফলন বাড়ানো হয়। সুতরাং নদীর তীরেই সভ্যতার কেন্দ্রগুলো গড়ে ওঠে।

এই সময়ে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে জিনিসপত্র বয়ে নেবার প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারও এই যুগে হয়। নদীপথে সহজে ও অল্প খরচে পরিবহন সম্ভব। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সুবিধার জন্যও বড় বড় নদীর তীরে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতাগুলো গড়ে ওঠে।

অনুশীলনী

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কিভাবে বিভিন্ন কারিগর-শ্রেণী গড়ে ওঠে ?

২। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে সমাজ-জীবনে কি কি পরিবর্তন দেখা দেয় ?

৩। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কিভাবে রাষ্ট্রের সূচনা হয় ?

৪। এই যুগের সভ্যতা নদীর তীরে গড়ে উঠলো কেন ?

(খ) অল্প কথায় উত্তর দাও ঃ

১। কেন শহর গড়ে ওঠে ?

২। ব্রোঞ্জ কিভাবে তৈরি হয় ?

৩। কিভাবে 'পুরোহিত-শ্রেণীর' উৎপত্তি হয় ?

৪। সমাজ কিভাবে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে ?

(গ) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। কোন্ যুগে প্রথম শহর গড়ে ওঠে ?

২। পালতোলা নৌকা কোন্ যুগে আবিষ্কৃত হয় ?

(ঘ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

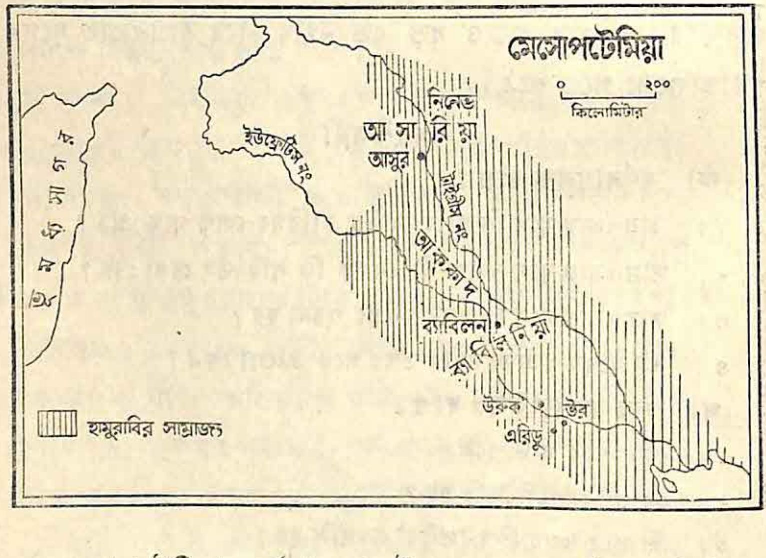
নীলনদের কূলে ——, টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর কূলে ——, সিন্ধুনদের কূলে —— ও —— এই যুগের শহরগুলো——ওঠে।

———

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন যুগের সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ

মেসোপটেমিয়া—ভৌগোলিক অবস্থিতি ও প্রাচীনত্বঃ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দুটি বিখ্যাত নদী টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্। এই দুটি নদী মিলিত হয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। কিন্তু মিলিত হবার আগে এই দুই নদী পৃথকভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে বহুদূর প্রবাহিত হয়েছে। এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম মেসোপটেমিয়া। 'মেসোপটেমিয়া' কথাটির অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ।



মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম ইরাক। এর পশ্চিমে সিরিয়ার মরুভূমি আর পূর্বে ইরাণ বা পারস্য। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ অংশকে 'সুমের' বলা হ'তো। এখানে অতি প্রাচীনকালে উর, উরুক, লাগস্ প্রভৃতি অনেকগুলি নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠে। মেসোপটেমিয়ার মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও কতকগুলি নগররাষ্ট্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কিশ্, আক্কাদ্ ও ব্যাবিলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই শহরগুলির মধ্যে কিশ্ই প্রাচীনতম। আনুমানিক ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এখানে নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে এই অঞ্চলের কিছু কিছু লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। উর, উরুক, লাগস্ প্রভৃতি শহরে কিছু মাটির ফলকে লেখা বিবরণ পাওয়া গেছে। ঐ সমস্ত বিবরণ থেকে এখানকার সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। মেসোপটেমিয়ার শহরগুলির আগে অন্য কোথাও এরকম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায় না। তাই এই অঞ্চলকেই প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্র বলে মনে করা হয়।

ভূমির উর্বরতা—নানা ধরনের ফসল—বন্যানিয়ন্ত্রণ : মেসোপটেমিয়ায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল ভূমির উর্বরতা। এ অঞ্চলে শীতকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির জলে নদীগুলোর কূল ছাপিয়ে বন্যা আসে। বন্যার ফলে যে পলি পড়ে তাতে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকেই সুমেরীয়গণ এক সুন্দর সেচ-ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তারা খাল কেটে বন্যার জলকে দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দেয়। ফলে বন্যার সম্ভাবনাও কমে যায়; আর নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলেও সেচের জল পাওয়া যায়। এর ফলে দেশের অধিকাংশ জমিই উর্বর হয়ে ওঠে।

প্রাচীন বিবরণ থেকে জানা যায় নদীর বন্যা ও সেচ-ব্যবস্থার ফলে এখানে জমি এতো উর্বর হয় যে, যতটা বীজ বোনা হ'তো তার প্রায় একশো গুণ ফসল পাওয়া যেতো। এই উর্বর জমিতে প্রচুর পরিমাণে গম, যব ও অন্যান্য খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হ'তো। এখানে খেজুর ও নানাবিধ শাকসব্জিও জন্মাতো। সুতরাং এখানকার কৃষকরা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী ফসল ফলাতো। এই উদ্বৃত্ত ফসলই এখানকার সমৃদ্ধির একটা কারণ।

মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বড় বড় নদীর কূলে। এই নদীগুলোর বন্যার ফলে এখানকার জমি ছিল উর্বর। কিন্তু বন্যার ফলে নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলো ডুবে যেতো। তার ফলে যেমন ফসল নষ্ট হ'তো তেমন ঘর-বাড়িও ডুবে যেতো। সুতরাং বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করার দরকার দেখা দিল।

সুমেরীয়গণ অতি প্রাচীনকাল থেকেই বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবন করে। নদী থেকে খাল কেটে তারা নদীর জল চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলও উর্বর হয়ে ওঠে। তা ছাড়া সুমেরীয়গণ বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা রোধ করে। তারা কিছু জলাধার নির্মাণ করেও জল সঞ্চয় করে। এই-ভাবে তারা তাদের শহরগুলোকে এবং চাষের জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। সেচ-ব্যবস্থা ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ফলে তাদের শহরগুলো সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

নানা ধরনের পেশা ঃ সুমেরীয় সভ্যতার মূলে ছিল কৃষিকাজ। ভূমির উর্বরতা ছিল এই কৃষিকাজের সহায়ক। সেচ-ব্যবস্থার ফলে নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলেও বেশী ফসল ফলানো যেতো। বলদে-টানা লাঙ্গল ও আরও কয়েকটি যন্ত্রের সাহায্যে কৃষকরা তাদের প্রয়োজনের অনেক বেশী ফসল ফলাতো। সুতরাং সকলকে আর চাষবাস করতে হ'তো না। তারা অন্য কাজে নিযুক্ত হতে পারতো।

সুমেরীয়গণ তামা ও টিনের ব্যবহার জানতো। তামা ও টিন মিশিয়ে তারা ব্রোঞ্জ তৈরি করতে পারতো। কিন্তু তখনো পর্যন্ত ধাতু খুব বেশী পাওয়া যেতো না। সুতরাং অনেক যন্ত্রপাতি তখনো পাথর, হাড় ও হাতীর দাঁতে তৈরি হ'তো। ধাতু, পাথর প্রভৃতির যন্ত্রপাতি তৈরি করাই ছিল বেশ কিছু লোকের পেশা।

কাপড় বোনার কাজেও বহু লোক নিযুক্ত হ'তো। আগে একই লোক সূতো কেটে কাপড় তৈরি করতো। কিন্তু এই যুগে কেউ সূতো কাটতো, কেউ কাপড় বুনতো। বড় বড় কারখানায় কাপড় বোনার কাজে অনেক লোক বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে কাজ করতো। রাজা বা পুরোহিতরা তাদের কাজ দেখাশুনার জন্য তদারককারী নিয়োগ করতো।

এই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল অনেকের পেশা। ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশির ভাগই হ'তো জলপথে। সুদূর মিশর ও ভারতের সাথেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। স্থলপথেও বাণিজ্য চলতো। চাকা লাগানো গাড়ির প্রচলনও এই যুগে দেখতে পাওয়া যায়।

তখন পর্যন্ত মুদ্রা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নাই। বিনিময়-প্রথায়ই বাণিজ্য চলতো।

এই সময়ে শহরগুলোকে প্রাচীরবেষ্টিত করা হ'তো। শহরের মধ্যে বড় বড় মন্দির, স্তম্ভ প্রভৃতি নির্মাণ করা-হ'তো। এই কাজে অনেক লোক নিয়োগ করা হ'তো। সুতরাং বেশ কিছু লোকের কাজ ছিল মন্দির প্রভৃতি তৈরি করা।

বড় বড় মন্দিরগুলোর অনেক সম্পত্তি থাকতো। মন্দিরগুলো ও তাদের সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য পুরোহিত-শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। মন্দিরগুলোর বিপুল সম্পত্তি ছিল এদের হাতে। সমাজে এদের প্রতিপত্তিও ছিল খুব বেশী।

এ ছাড়া এ যুগে ছাঁচে করে ইট তৈরি করা হ'তো। ইট তৈরির এবং মাটির পাত্র তৈরির কাজেও অনেক লোক নিয়োগ করা হ'তো।

সুমেরীয়দের সভ্যতা—তাদের কৃতিত্ব: সুমেরীয়রা গড়ে তুলেছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। এই সভ্যতা ছিল উন্নত ধরনের। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সুমেরীয়রা খিলান নির্মাণ করতে শেখে। শহরের জল বের করে দেবার জন্য নর্দমা নির্মাণ করা হ'তো। শহরের বড় বড় বাড়িগুলোর অধিকাংশ ছিল ইটের তৈরি। পোড়ামাটির খোদাই করা মূর্তি দিয়ে এই বাড়িগুলোর বাইরের দিক সাজানো হ'তো। ভিতরের দেওয়ালগুলোতে নানারকম ছবি আঁকা হ'তো।

মন্দিরগুলো ছিল এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা। ইট প্রভৃতি দ্বারা তৈরী কৃত্রিম পাহাড় বা ঢিপির উপর এই মন্দিরগুলো তৈরি করা হ'তো। প্রথম দিকে রৌদ্রে শুকানো ইট দিয়ে এই মন্দিরগুলো তৈরি করা হ'তো। পরে এই মন্দির তৈরির জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে পাথর আমদানি করা হ'তো। এই পাথরে-তৈরী মন্দিরের উপরের দিক তামার পাতের উপর মূল্যবান পাথর প্রভৃতি দিয়ে সাজানো হ'তো। কৃত্রিম পাহাড় তৈরি করে তার উপর মন্দির গড়া হ'তো। মন্দিরগুলোতে এককক্ষ-বিশিষ্ট সু-উচ্চ চূড়া থাকতো। এই চূড়াগুলো কখনও কখনও সাত-তলা পর্যন্ত

উঁচু হ'তো। একারণে চূড়াগুলো বহুদূর থেকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

এখানে পাথর ও ধাতুর উপর খোদাই করা মূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে পাথর, তামা ও রূপোর উপর খোদাই করা বেশ কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলোর সৌন্দর্য ও সজীবতা অতুলনীয়।

সুমেরীয়গণ তামা ও টিন থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারতো। তামা ও টিন মিশিয়ে তারা ব্রোঞ্জ তৈরি করতে পারতো। তারা ব্রোঞ্জের অনেক যন্ত্রপাতিও নির্মাণ করে। শুধু তামা, টিন ও ব্রোঞ্জ নয়—তারা সোনা ও রূপো দিয়ে সুন্দর সুন্দর পাত্র নির্মাণ করতো। এই পাত্রগুলোর উপর জীবজন্তুর ছবি সুন্দরভাবে খোদাই করা থাকতো।

সুমেরীয়রা অতি প্রাচীনকালে জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতি করেছিল। নৌকা ও চাকা লাগানো গাড়ি—দুই-এর ব্যবহারই তারা সমানভাবে করতো। যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। সুদূর ভারতবর্ষ ও মিশরের সাথেও তাদের বাণিজ্য চলতো। সুমেরীয়গণই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সোনা ও রূপোকে মূল্যমান হিসাবে গ্রহণ করে।

৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেই সুমেরীয়গণ বর্ণমালা আবিষ্কার করে ও লিখতে শেখে। তারাই প্রথমে বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপন করে। পরবর্তী সভ্যতাগুলির অধিকাংশ নিদর্শনই এখানে পাওয়া যায়।

মিশর

ভৌগোলিক অবস্থিতি ও ভূ-প্রকৃতি ঃ আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে মিশরের অবস্থিতি। এর উত্তর দিকে আছে ভূমধ্যসাগর আর পূর্বে সুয়েজ উপসাগর ও লোহিত সাগর। এর দু'পাশে আছে মরুভূমি—পূর্বদিকের আরব মরুভূমি এসে লোহিত সাগরের সাথে মিশেছে। বিখ্যাত নীল নদ সমগ্র মিশরকে উর্বর করে তুলেছে।

নীল নদের উপত্যকা ছাড়া সমগ্র উত্তর-পূর্ব আফ্রিকাই মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। ভূমধ্যসাগরে পড়ার আগে নীল নদ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে একটা ব-দ্বীপ রচনা করেছে। এই ব-দ্বীপের দক্ষিণে অনেকগুলো জলাভূমি বা বিলের মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে নীল নদ। প্রতি বছর নীল নদে বন্যা আসে। এর ফলে মিশরের জমি হয় উর্বর।



জলাভূমির আশেপাশের জঙ্গলে আছে নানারকমের পশু-পাখী। মিশরে আছে খেজুর ও ডুমুর-জাতীয় নানারকম ফলের গাছ। নীল নদ মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য ও মাল পরিবহনের পথও সুগম করেছে। জলপথে মাল পরিবহন ছিল সহজ ও সুলভ। এই সব কারণে মিশরকে বলা হয় 'নীল নদের দান'। নীল নদ না থাকলে মিশরও মরুভূমিতে পরিণত হ'তো।

নীল নদের উপত্যকার পাশের পাহাড় থেকে পাথর পাওয়া যেতো। আর কাছের নুবিয়ার পাহাড় থেকে পাওয়া যেতো সোনা।

মিশরের গোড়ার কথা ঃ মিশরের প্রাচীন অধিবাসীদের প্রধান পেশা ছিল চাষবাস। তারা প্রথমে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে বাস করতো। কিন্তু চাষবাসের জন্য প্রয়োজন ছিল সেচ-ব্যবস্থার। ছোট ছোট গোষ্ঠীর পক্ষে খাল কেটে সেচ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তাই কতকগুলো গোষ্ঠী নিয়ে এক-একটা বড় দল গঠিত হয়। এই বড় দলগুলিকে বলা হ'তো 'নোম'।

কালক্রমে এই নোমগুলি মিলিত হয়ে দুটো রাজ্যে পরিণত হয়। দক্ষিণের রাজ্যের শাসনকর্তা উত্তরের রাজ্য জয় করেন এবং সমগ্র মিশরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। যে রাজা সমগ্র মিশরকে ঐক্যবদ্ধ করেন তাঁর নাম মেনেস্। তাঁর উপাধি ছিল ফ্যারাও। এই সময় থেকে মিশরের সম্রাটদের বলা হ'তো ফ্যারাও।



মিশরের ফ্যারাও

ফ্যারাও, পুরোহিত, কেরানী, কর-সংগ্রাহক ও শ্রমিক—শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো ঃ ফ্যারাও বা সম্রাট ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তাঁকে দেবতা মনে করা হ'তো। তিনি ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। সমস্ত জমি থেকেই তিনি কর পেতেন। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। রাজধানীতে বসে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে শাসনকার্যের তদারক করতেন। সভাসদদের প্রধানদের নিয়ে একটা সমিতি গঠন করা হ'তো। এই সমিতি রাজাকে পরামর্শ দিত।

পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে তামা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য তিনি অভিযান প্রেরণ করতেন। অন্য জাতির আক্রমণ থেকে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বও ছিল তাঁর। বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে ঝগড়া-বিরোধে

দেশের শান্তি নষ্ট হ'তো। এই বিরোধ বন্ধ করে তিনি শান্তিরক্ষা করতেন।

রাজ-কর্মচারীদের সাহায্যে ফ্যারাও দেশ শাসন করতেন। রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উজির। ফ্যারাও-এর পর তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তিনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতেন এবং অর্থদপ্তরের দেখাশুনা করতেন। এ ছাড়া আরও অনেক রাজকর্মচারী ছিল। ফ্যারাও রাজধানীতে জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন।



ওসিরিস্—
মিশরীয় দেবতা

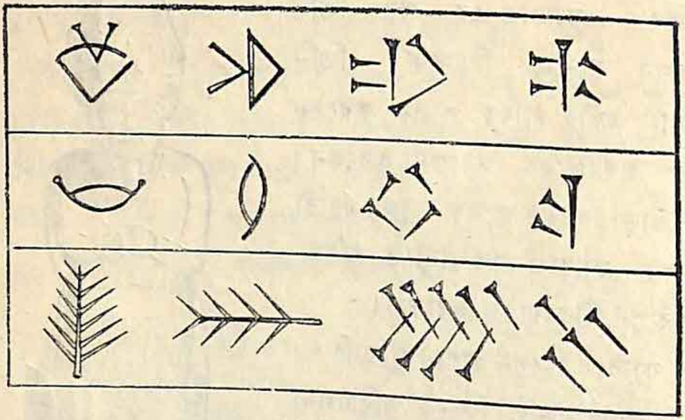
ফ্যারাও ছিলেন প্রধান পুরোহিত। ধর্মের অনুষ্ঠানগুলি তিনিই পরিচালনা করতেন। ধর্মানুষ্ঠান ও মন্দিরগুলো দেখাশুনার জন্য ফ্যারাও পুরোহিত নিযুক্ত করতেন। এই পুরোহিতদের কাজ ছিল ফ্যারাও-এর মঙ্গলের জন্য দেবতাদের পূজা দেওয়া। কালক্রমে পুরোহিতের পদ বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। মন্দিরের ব্যয়নির্বাহের জন্য এবং পুরোহিতদের ভরণ-পোষণের জন্য জমি দেওয়া হ'তো। পুরোহিতরাই এই জমির দেখাশুনা করতো।

ফ্যারাও দেবতার বংশধর এবং দেবতারই অংশ। তাঁর অসীম ক্ষমতার মূলে ছিল এই ধারণা। এই ধারণা ও বিশ্বাসকে জনপ্রিয় করার দায়িত্ব ছিল পুরোহিতদের। দেবতাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান, জাদুবিদ্যা প্রভৃতির প্রয়োজন। এই সব বিষয়ে পুরোহিতরাই ছিল অভিজ্ঞ। পুরোহিতের পদ বংশানুক্রমিক হবার পর তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তারাই ছিল সম্রাটের গোপন পুলিশ-বাহিনী।

পুরোহিতরা বাস করতো মন্দিরে। মন্দিরের সম্পত্তির আয় ছিল তাদের হাতে। তাদের যুদ্ধে যেতে হ'তো না ও কোন কর দিতে

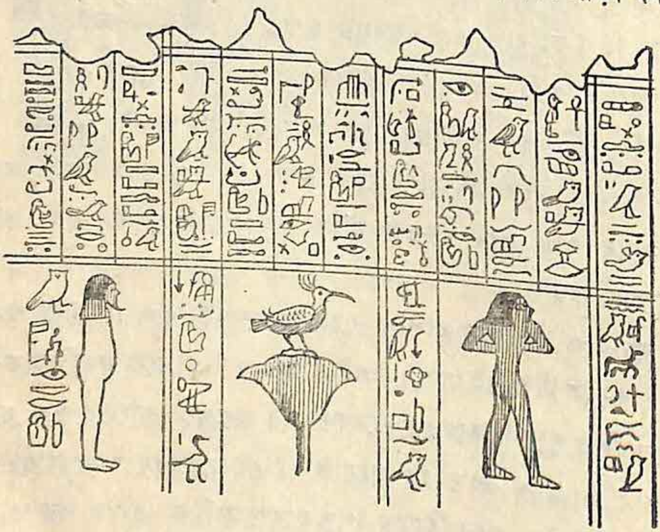
হ'তো না। এক কথায় তারা বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদা পেতো। এইভাবে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা এতো বৃদ্ধি পেল যে, তারা রাজ-পরিবার বা অভিজাতদের চেয়েও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলো।

তিন হাজার বছরেরও আগে মিশরীয়রা লিখতে শেখে। এই



কিউনিফর্ম লিপি

সময়ে তারা 'হায়ারোগ্লিপস্' বা এক ধরনের চিত্রলিপি আবিষ্কার করে। এই লিপি এতো জটিল ছিল যে, বিশেষ শিক্ষা ছাড়া কারও



হায়ারোগ্লিপস্ লিপি

পক্ষে এটা আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। এই শিক্ষা যারা গ্রহণ করে তারা এক বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হয়। প্রথমে সরকারী হিসাবপত্র

ও বিবরণ লেখার জন্যই এই লিপি প্রচলিত হয়। ফলে এই শ্রেণীই সরকারের কেরানীর কাজগুলো করতো। সরকারের সমস্ত কাজের



ব্রাহ্মী লিপি

বিবরণ ও হিসাবপত্র রাখার দায়িত্ব ছিল তাদের। বড় বড় জমিদারি-গুলির হিসাবপত্রও তারা রাখতো।

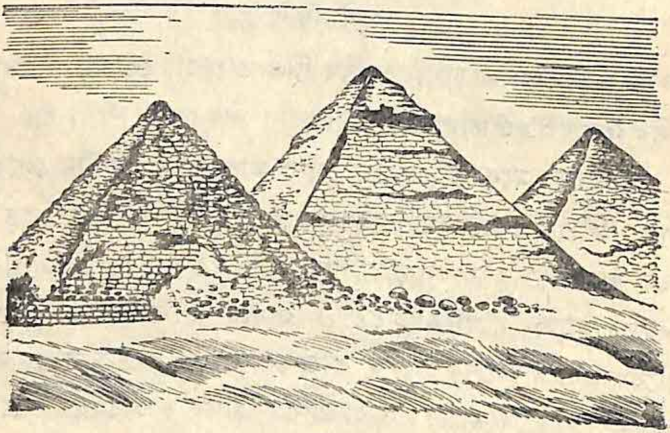
শ্রমিকদের মধ্যে দু' শ্রেণীর লোক থাকতো। স্বাধীন লোক ও দাস। পিতার পেশা পুত্র গ্রহণ করবে, এই ছিল রীতি। বড় বড় যুদ্ধের ফলে দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এদের বড় বড় জমিদারি ও মন্দিরের কাজে লাগানো হ'তো। স্বাধীন শ্রমিকরা এক-একজন সর্দারের অধীনে বিশেষ বিশেষ কাজ করতো। অনেক সময়ে তারা সময়মত মজুরী পেতো না। তারা প্রায়ই প্রতিবাদ ও ধর্মঘট করতো। গ্রামের কৃষকদের অনেক সময়ে জোর করে কাজে লাগানো হ'তো।

ব্যবসা-বাণিজ্য : এই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো বিনিময় প্রথায়। বাজারে কিভাবে কেনাবেচা হ'তো, এই সময়ে আঁকা ছবিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সব ছবিতে দেখা যায় এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস দেওয়া হচ্ছে। এই সময়ে অন্য দেশের সাথে বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। কিন্তু এই সময়ে সব দেশেই বেশী করে শুল্ক আদায় করা হ'তো। ফলে, অন্য দেশের সাথে বাণিজ্যের অসুবিধা হ'তো।

কিন্তু এই বাধা সত্ত্বেও মিশর বিদেশের সাথে বাণিজ্যে প্রচুর লাভবান হয়। মিশর অন্য দেশ থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করতো, আর তৈরী জিনিস অন্য দেশে রপ্তানি করতো। অন্য দেশে মিশরের তৈরী জিনিসের আদর ছিল। সিরিয়া, ক্রীট, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে লোকে জাহাজে করে মিশরে বাণিজ্য করতে আসতো। মিশরের জাহাজও দূরদেশে বাণিজ্য করতে যেতো।

এই যুগে মুদ্রার প্রচলন হয়নি। তাই অধিকাংশ বাণিজ্যই হ'তো বিনিময় প্রথায়। কিন্তু এই সময়ে সোনার আংটি ও সোনার বাট দিয়েও কেনাবেচা হ'তো।

পিরামিড ঃ মিশরের রাজাদের মৃতদেহ রাখার জন্য এক বিশেষ ধরনের পাথরের স্তূপ তৈরি করা হ'তো। এই স্তূপগুলোকেই বলা হ'তো পিরামিড। পরে রাজার প্রধান প্রধান অনুচরদের মৃতদেহ



পিরামিড

রাখার জন্যও এই রকম স্তূপ বা পিরামিড তৈরি করা হ'তো। এক কথায় বলতে গেলে, পিরামিডগুলো ছিল পাথরের তৈরি বিশাল কবর-ঘর।

রাজাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়ার সাথে সাথে পিরামিডগুলোর আয়তনও বৃদ্ধি পায়। মিশরে আজ পর্যন্ত সত্তরটি পিরামিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সম্রাট খুফুর তৈরী পিরামিডই সবচেয়ে বড় ও জমকালো। ২,৪০০ বর্গফুট

জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে এই বিশাল পিরামিড। এর উচ্চতা হ'লো ৪৮১ ফুট। এই পিরামিড তৈরি করতে তেইশ লক্ষ পাথর লেগেছে। প্রতিটি পাথরের ওজন গড়ে আড়াই টন। এক লক্ষ লোক কুড়ি বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই পিরামিড তৈরি করেছে।

পিরামিডের মধ্যে থাকতো রাজার মৃতদেহ। মৃত্যুর পর দেহের মাথার ঘিলু ও পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে নেওয়া হ'তো। তার পর দেহের মধ্যে সুগন্ধি ওষুধ ঢুকিয়ে দিয়ে দেহকে বিশেষ ওষুধ বা রাসায়নিক দ্রব্যে সত্তর দিন ডুবিয়ে রাখা হ'তো। তারপর দেহকে স্নান করিয়ে গঁদের আঠা-মাখানো মোমের প্রলেপ দেওয়া কাপড়ে জড়ানো হ'তো। তারপর মনুষ্যাকৃতি কাঠের শবাধারে ওই দেহ রাখা হ'তো এবং শবাধারকে কবর-ঘরের দেওয়ালে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'তো। এইভাবে রাখা মৃতদেহকে মমি বলা হয়।

এইভাবে দেহ রাখলে দেহ নষ্ট হয় না। মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো মানুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও তার আত্মার এক বিশেষ অংশ জীবিত থাকে। সুতরাং দেহকে অবিকৃত রাখলে এবং কবর-ঘরে খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া হলে ঐ আত্মা জীবিত থাকে। মৃত্যুর পরও মানুষের সব জিনিসেরই প্রয়োজন। তাই কবর-ঘরে মৃতের সাথে তার স্ত্রী ও দাসদেরও রাখা হ'তো। পিরামিড তৈরী ও মৃতদেহ রক্ষার সাথে মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস জড়িত ছিল।

ধর্মবিশ্বাস ঃ ধর্মই ছিল মিশরীয়দের জীবনে সবচেয়ে বড় কথা। তাদের শিল্প, সাহিত্য, শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতিতে ধর্মের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশী। আদি যুগ থেকে আকাশকে তারা প্রধান দেবতা বলে মনে করতো। আকাশকে এক বিশাল খিলান বলে মনে করা হ'তো। এই বিশাল খিলানের নিচে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল গাভী। এই গাভীর নাম 'হ্যাথর দেবী'। আবার কখনও কখনও আকাশকে 'শিবু' এবং পৃথিবীকে 'নুইত দেবী' বলে মনে করা হ'তো। চাঁদকেও দেবতা বলে পূজা করা হ'তো। সূর্যকে 'রা-দেবতা' বলা হ'তো। তিনি ছিলেন স্রষ্টা। তাঁর কিরণ পেয়েই দেবী পৃথিবী শস্যপূর্ণা হ'তো।

মিশরীয়রা নানারকম গাছপালাকেও দেবতা মনে করতো। তাল, খেজুর, ডুমুর প্রভৃতি গাছ যাদের থেকে তারা ছায়া ও ফল পেতো, তারা ছিল তাদের কাছে দেবতা। মরূদ্যানের ঝরনাও তাদের কাছে ছিল দেবতা।

নানাবিধ জন্তু-জানোয়ারও তাদের কাছে দেবতাজ্ঞানে পূজা পেতো। ষাঁড়, গাভী, ছাগল, ভেড়া, কুমীর, বাজপাখী, কুকুর, বিড়াল, শিয়াল, সাপ—সবই ছিল তাদের পূজার পাত্র। ওসিরিস্ ছিলেন নীল নদের দেবতা। রা, হোরাস, ওসিরিস্ ও আইসিস্ই ছিল মিশরীয়দের প্রধান দেবতা। রা ও হোরাস্ ছিলেন সূর্য। ওসিরিস্ ছিলেন নীল নদের দেবতা আর আইসিস্ ছিলেন মাতৃকা দেবী।

মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাসের মূলে ছিল অমরত্বে বিশ্বাস। প্রতি বছর বন্যার পর নীল নদ শুকিয়ে আসে—শীর্ণকায় হয়ে পড়ে। আবার নীল নদে বন্যা আসে—দু-কূল ছাপিয়ে যায়। এই ঘটনাকে নীল নদের দেবতা ওসিরিসের মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ বলে মনে করা হ'তো। বৃক্ষ-লতা-পাতাও প্রতি বছর শুকিয়ে যায় ও নতুন জীবন লাভ করে। সুতরাং মানুষও মৃত্যুর পর আবার নতুন জীবন লাভ করতে পারে। দেহ যদি অবিকৃত রাখা যায় এবং তাকে উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া হয়, তা হলে মৃত্যু এড়ানো যায়। এই সব মৃত লোকের মধ্যে যারা কোন পাপ করেনি, দেবতা ওসিরিস্ তাদের খাদ্যে-ভরা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। সেখানে তারা চির-জীবন লাভ করতো।

মিশরীয়দের পেশা ঃ মিশরীয়দের মধ্যে যারা গ্রামে বাস করতো, তাদের পেশাই ছিল চাষবাস। নীল নদের বন্যায় এখানকার জমি ছিল উর্বর। সুতরাং এখানকার জমিতে প্রচুর ফসল ফলতো। কিন্তু যে কৃষক এখানকার জমি চাষ করতো তাদের ভাগে ফসলের খুব সামান্য অংশই জুটতো। সমস্ত জমির মালিক ছিলেন ফ্যারাও। সুতরাং কৃষকদের প্রচুর কর দিতে হ'তো। কর-সংগ্রাহকরা তার জমি থেকে অধিকাংশ ফসলই নিয়ে যেতো। আবার রাজা তাদের খাল কাটা, পাথর বওয়া, রাস্তা তৈরি করা প্রভৃতি কাজে লাগাতেন।

এর জন্য তারা কোন মজুরী পেত না। সুতরাং যে কৃষকদের জন্য মিশরের সমৃদ্ধি সেই কৃষকদেরই অবস্থা ছিল শোচনীয়।

শহরে নানা পেশার লোক দেখা যেতো। এক শ্রেণীর লোক তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করতো। এদের কর্মকার বলা চলে। আর-একদল ছিল ছুতোর মিস্ত্রী—তারা সুন্দর সুন্দর নৌকা, গাড়ি, চেয়ার, শবাধার প্রভৃতি নানা ধরনের কাঠের জিনিস তৈরি করতো। এ ছাড়া ছিল তাঁতী, কুমোর, রাজমিস্ত্রী, জহুরী প্রভৃতি। এদের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। এরা বড় বড় জমিদারি বা রাজার কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকতো। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসাবেই তারা কাজ করতো। এদের মজুরী এই সব প্রতিষ্ঠানের দয়ার উপর নির্ভর করতো। এ ছাড়া কিছু লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। আর এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা সরকারী চাকুরী করতো। তাদের লেখক বা কেরানী বলা হ'তো।

সিন্ধু-সভ্যতা

আবিষ্কারের কথা: মেসোপটেমিয়ার সভ্যতাকে প্রাচীনতম সভ্যতা বলা হয়। কিন্তু প্রায় একই সময়ে ভারতেও প্রায় একই ধরনের এক সভ্যতা গড়ে ওঠে। তবে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে এই সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না।

১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন মার্শাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দয়ারাম সাহানি সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদারোতে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের হরপ্পায় খননকার্য চালান। এই খননকার্যের ফলে এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। এই দুই জায়গায় দুটি বড় শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সরস্বতী নদীর তীরে কালীবঙ্গম নামক স্থানে অনুরূপ আর একটি শহরের চিহ্নও আবিষ্কৃত হয়েছে। এরপর পাঞ্জাব থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে সিন্ধু নদ বা তার শাখানদীগুলির তীরে। তাই এই সভ্যতাকে

সিন্ধু-সভ্যতা বলা হয়। আবার এই সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র হরপ্পার নাম থেকে একে হরপ্পা-সভ্যতাও বলা হয়। উত্তর থেকে



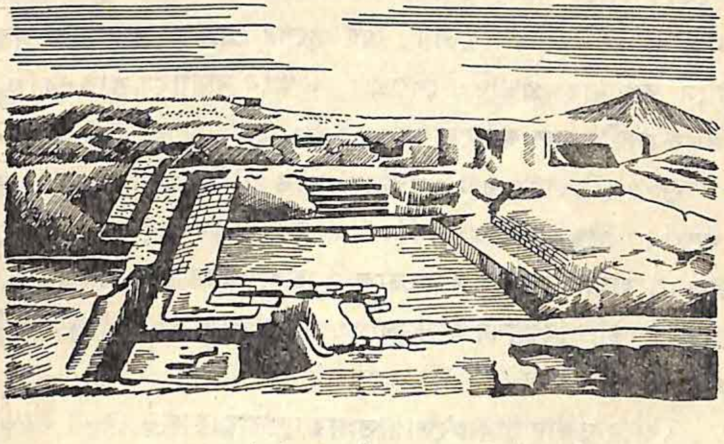
দক্ষিণে প্রায় ৯৫০ মাইল বিস্তীর্ণ এলাকায় এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

এখানে যে শহর ও গ্রামগুলো গড়ে উঠেছিল সেখানে খননকার্য চালিয়ে নানারকম জিনিস পাওয়া গেছে। এই সব জিনিসের মধ্যে আছে বাসনপত্র, প্রসাধনের জিনিস, নানাবিধ মাটির পাত্র, পোড়ামাটির মূর্তি, পাশা, দাবা, সীলমোহর প্রভৃতি। এখানে পাথরে খোদাই করা মূর্তি এবং তামার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেছে। তামার তৈরী একখানা ছোট দু'-চাকার গাড়িও এখানে পাওয়া গেছে। সোনা ও রূপার বালা, দুল ও হারও এখানে পাওয়া গেছে। এই সমস্ত জিনিস থেকে আমরা এখানকার লোকের সভ্যতা সম্বন্ধে জানতে পারি।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগের শহর : সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা শহর ছিল একই পরিকল্পনা অনুসারে তৈরী।

এখানকার রাস্তাগুলো ছিল প্রশস্ত ও সোজা। কোন-কোনটা ৩৪ ফুট পর্যন্ত চওড়া। এ ছাড়া দুই রাস্তার মাঝে অনেক গলিপথও ছিল। সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক গলিপথে একটা করে কূপ ছিল। রাস্তায় আলো জ্বালার ব্যবস্থাও ছিল। জলনিকাশের জন্য বহু-সংখ্যক নর্দমা তৈরি করা হয়েছিল।

শহরে ছোট বড় অনেক বাড়ি ছিল। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে কূপ, স্নানাগার ও নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। পোড়া ইট দিয়ে তৈরী এই বাড়িগুলোর কোন-কোনটা ছিল দোতলা। মহেঞ্জোদারোতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটা বড় স্নানাগার ছিল। এখানকার



মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ : স্নানাগার

পুকুরটা দৈর্ঘ্যে ছিল ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট। পুকুরের জল বের করে দেবার ও জল ভরারও ব্যবস্থা ছিল। হরপ্পায় একটা বড় শস্যাগারও আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রত্যেক শহরের এক পাশে একটা করে সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। এই দুর্গ ছিল প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত। এখানে সম্ভবতঃ সরকারী কাজ হ'তো। ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও জায়গা ছিল এই দুর্গ। এখানকার শহরগুলি দেখলে মনে হয় যে, এখানে খুব উন্নত ধরনের পৌর-শাসন-ব্যবস্থা বর্তমান ছিল।

এখানকার শহরের জল-নিকাশের ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নর্দমাগুলো আগাগোড়া ইট দিয়ে ঢাকা থাকতো।



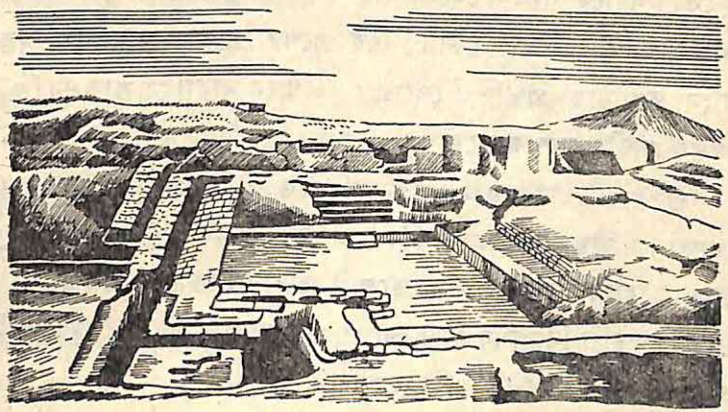
দক্ষিণে প্রায় ৯৫০ মাইল বিস্তীর্ণ এলাকায় এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

এখানে যে শহর ও গ্রামগুলো গড়ে উঠেছিল সেখানে খননকার্য চালিয়ে নানারকম জিনিস পাওয়া গেছে। এই সব জিনিসের মধ্যে আছে বাসনপত্র, প্রসাধনের জিনিস, নানাবিধ মাটির পাত্র, পোড়া-মাটির মূর্তি, পাশা, দাবা, সীলমোহর প্রভৃতি। এখানে পাথরে খোদাই করা মূর্তি এবং তামার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেছে। তামার তৈরী একখানা ছোট দু'-চাকার গাড়িও এখানে পাওয়া গেছে। সোনা ও রূপার বালা, দুল ও হারও এখানে পাওয়া গেছে। এই সমস্ত জিনিস থেকে আমরা এখানকার লোকের সভ্যতা সম্বন্ধে জানতে পারি।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগের শহর : সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা শহর ছিল একই পরিকল্পনা অনুসারে তৈরী।

সংখ্যক নর্দমা তৈরি করা হয়েছিল।

শহরে ছোট বড় অনেক বাড়ি ছিল। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে কূপ, স্নানাগার ও নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। পোড়া ইট দিয়ে তৈরী এই বাড়িগুলোর কোন-কোনটা ছিল দোতলা। মহেঞ্জোদারোতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটা বড় স্নানাগার ছিল। এখানকার



মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ : স্নানাগার

পুকুরটা দৈর্ঘ্যে ছিল ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট। পুকুরের জল বের করে দেবার ও জল ভরারও ব্যবস্থা ছিল। হরপ্পায় একটা বড় শস্যাগারও আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রত্যেক শহরের এক পাশে একটা করে সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। এই দুর্গ ছিল প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত। এখানে সম্ভবতঃ সরকারী কাজ হ'তো। ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও জায়গা ছিল এই দুর্গ। এখানকার শহরগুলি দেখলে মনে হয় যে, এখানে খুব উন্নত ধরনের পৌর-শাসন-ব্যবস্থা বর্তমান ছিল।

এখানকার শহরের জল-নিকাশের ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নর্দমাগুলো আগাগোড়া ইট দিয়ে ঢাকা থাকতো।

অন্য কোন প্রাচীন সভ্যতায় এখানকার মত সুন্দর নর্দমার ব্যবস্থা দেখা যায় না।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য : গম, যব, মটর-কলাই প্রভৃতি ছিল এখানকার জনসাধারণের প্রধান খাদ্য। এখানে প্রচুর পরিমাণে তিল জন্মাতো। রান্নার জন্য সম্ভবতঃ তিলের তেলই ব্যবহার করা হ'তো। কেউ কেউ মনে করেন এখানে ধানের চাষও হ'তো।

এখানে গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে ছিল গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শূকর, গাধা, কুকুর প্রভৃতি। এখানে হাঁস, মুরগী প্রভৃতিও পোষা হ'তো। নদীতে পাওয়া যেতো মাছ। আরব সাগরের উপকূল থেকেও মাছ আমদানি করা হ'তো। এই যুগের লোকে নানাবিধ জন্তুর মাংস, দুধ, মাছ প্রভৃতিও খেতো। এখানে নানাবিধ শাকসব্‌জি ও খেজুর জাতীয় ফল জন্মাতো।

সুতরাং এখানকার মানুষ নিরামিষ ও আমিষ দু'রকমের খাবারই খেতো। খাদ্যশস্যের মধ্যে ছিল গম, যব, মটরকলাই এবং সম্ভবতঃ চাল। রান্না হ'তো তিলের তেলে। তারা যেমন দুধ, শাকসব্‌জি ও খেজুর প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্য খেতো, তেমন মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্যও নিয়মিত খেতো।

এখানে তূলার চাষ হ'তো। তূলার সূতোয় কাপড় বোনা হ'তো। সম্ভবতঃ পশমের কাপড়ও ব্যবহার করা হ'তো। মেয়ে-পুরুষ সকলেই নানারকমের গহনা পরতো। সোনা, রূপা, তামা ও নানারকম দামী পাথর দিয়ে এই গহনাগুলো তৈরি হ'তো। গহনার মধ্যে হার, আংটি, তাগা, দুল, বালা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মেয়েরা নানাবিধ প্রসাধনদ্রব্যও ব্যবহার করতো। ব্রোঞ্জের আয়না, হাতীর দাঁতের চিরুনি এবং আরও অনেক প্রকার প্রসাধন দ্রব্যেরও প্রচলন ছিল।

এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র তৈরি হ'তো। এগুলো আবার রং করা হ'তো। সূঁচ, কুঠার, করাত, কাস্তে, বঁড়শী প্রভৃতি অনেক জিনিসই এখানকার লোকে তৈরি করতো। এরা সুন্দর সুন্দর কাঠের চেয়ার ও খাটও তৈরি করতো। এরা নানারকম খেলনাও তৈরি করতো। এদের প্রধান যানবাহন ছিল গরুর গাড়ি। এরা

ওজন-দাঁড়ির ব্যবহার জানতো। যুদ্ধের সময়ে এরা কুঠার, বর্শা, ছোরা, তীরধনুক, গদা, তরবারি প্রভৃতি ব্যবহার করতো। এদের মধ্যে ঢাল ও বর্মেরও প্রচলন ছিল। এরা সুন্দর সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করতো। এদের তৈরী মানুষ ও নানা পশুর মূর্তির তুলনা মেলা ভার। মহেঞ্জোদারোতে অনেক সুন্দর সুন্দর সীলমোহর পাওয়া গেছে। এই সীলমোহরের উপরের লেখাগুলো এখনো পড়া সম্ভব হয় নাই।



চিত্রিত মাটির পাত্র

শিল্প ও পেশা : সিন্ধু-সভ্যতার মূল কেন্দ্র মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মত বড় বড় শহর। এই সব শহরে বহু লোক বাস করতো। এই সব জনবহুল শহরের জন্য প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন। সিন্ধু-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ সিন্ধু নদের তীরে। এখানকার ভূমি ছিল উর্বর। এখানে জলসেচের সুবিধাও ছিল প্রচুর। খননকার্যের সময়ে এখানে এক জায়গায় প্রচুর চাষের সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। এ থেকে জানা যায় যে, এখানে ব্যাপক চাষবাসের ব্যবস্থা ছিল।

এখানে নানারকম শিল্পও গড়ে উঠেছিল। অনেকে তূলা ও পশমের সুতো কাটতো। খননকার্যের ফলে এখানে অনেক টাকু, চরকা প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কাপড় বোনাও এখানকার একটা বড় শিল্প ছিল। কাপড় রং করার বড় বড় পাত্র পাওয়া গেছে। সুতরাং এখানে কাপড় রং করার শিল্পও গড়ে উঠেছিল। এখানকার লোকেরা কুমোরের চাকের সাহায্যে নানারকম মাটির পাত্রও তৈরি করতো। কিছু কিছু মাটির পাত্রে রং করা হ'তো এবং নানারকম নকৃশা কাটা হ'তো।

এখানে ধাতুশিল্পও গড়ে উঠেছিল। তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি দিয়ে অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরি হ'তো। সোনা, রূপা, দামী পাথর প্রভৃতি দিয়ে নানারকম গহনাও তৈরি হ'তো। এখানে পোড়ামাটি, পাথর

ও হাতির দাঁতের সীলমোহর তৈরি করা হ'তো। এখানকার লোকেরা কাঠের আসবাবপত্রও তৈরি করতো।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এখানকার লোকেরা ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য করতো এবং অনেক শিল্প গড়ে তুলেছিল। তারা বহু দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যও করতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য : সিন্ধু-সভ্যতার যুগের লোকেদের জীবনযাত্রা ছিল উন্নত ধরনের। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা ধনসঞ্চয় না করলে এই রকম জীবনযাত্রা সম্ভব নয়। বালুচিস্তানের গ্রামগুলির সাথে এদের বাণিজ্য চলতো। কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি করা হ'তো দূর দেশ থেকে। সৌরাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্য থেকে শঙ্খ ও বিশেষ ধরনের পাথর আনা হ'তো। রূপো ও দামী পাথর আনা হ'তো পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে। রাজস্থান, তিব্বত, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও অনেক জিনিস আমদানি করা হ'তো।

গুজরাটের লোথাল অঞ্চলে খননকার্যের ফলে পোতাশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য মেসোপটেমিয়ায় রপ্তানি করা হ'তো। সিন্ধু-সভ্যতার যুগের অনেক ভারতীয় সীলমোহর সুমের অঞ্চলে পাওয়া গেছে। ভারতীয় বণিকরা এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তূলা রপ্তানি করতো।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগের মানুষ দূর দূর দেশের সাথে বাণিজ্য করতো। এই বাণিজ্য চলতো স্থলপথে ও জলপথে। লোথাল অঞ্চলে পোতাশ্রয় ছিল একথা খনকার্যের ফলে জানা গেছে। এই যুগের কিছু কিছু সীলমোহরের উপর জাহাজের নক্শা খোদাই করা আছে।

বহু দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয়। এই যুগে বণিকরা ছিল ধনী। বিদেশের সাথে বাণিজ্যের ফলে এই সময়ে ভারত লাভবানই হয়।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগের ধর্ম : সীলমোহর এবং মাটির, ধাতুর ও পাথরের ছোট ছোট মূর্তি থেকে আমরা এই যুগের ধর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। এখানে কোন মন্দির বা বেদী আবিষ্কৃত হয় নাই। সীলমোহরগুলোর উপর খোদাই করা লেখাও

পড়া সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ঐ সব মূর্তি থেকে ধর্ম সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করতে পারি মাত্র।

এই যুগের লোকেরা মাতৃকাদেবীর পূজা করতো। নানা জায়গায় বহুসংখ্যক ছোট ছোট নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। কোন কোন মূর্তিতে ধোঁয়ার দাগ দেখা যায়। এর থেকে মনে হয় এই দেবীমূর্তিগুলির সামনে গন্ধদ্রব্য পোড়ানো হ'তো। সম্ভবতঃ এই মাতৃকাদেবী প্রকৃতিদেবী বলে পূজিতা হতেন। এই মাতৃকাদেবীর উদ্দেশ্যে পশুবলির ব্যবস্থা ছিল। কেউ কেউ মনে করেন এখানে নরবলিও হ'তো।



দেবদেবী—সিন্ধু-উপত্যকা

পুরুষ-দেবতার মধ্যে ত্রিমুখ দেবতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পদ্মাসনে বসা এই দেবতাকে ঘিরে আছে—হাতি, বাঘ, গণ্ডার প্রভৃতি নানা জাতির পশু। পণ্ডিতেরা এই দেবতাকে ত্রিমুখ পশুপতি, যোগীশ্বর বা শিব মনে করেন। সুতরাং একথা মনে করা যায় যে, মাতৃকাদেবীর সাথে শিবও এখানে পূজা পেতেন। শিবের যে শুধু মূর্তিপূজাই হ'তো তা নয়, এখানে লিঙ্গপূজারও প্রচলন ছিল।

এখানে বিভিন্ন পশুও পূজা পেতো। হাতি, গণ্ডার, বাঘ প্রভৃতি পশুকে পূজা করা হ'তো। ষাঁড়কে পবিত্র মনে করে বিশেষভাবে

পূজা করা হ'তো। এর মধ্যে কোন কোন পশুকে আবার দেবতাদের বাহন বলেও মনে করা হ'তো। সূর্যের চিহ্ন হ'লো স্বস্তিকা ও চক্র। কতকগুলো সীলমোহরের উপর স্বস্তিকা ও চক্রের চিহ্ন খোদিত আছে। এর থেকে মনে হয় এখানে সূর্যপূজারও প্রচলন ছিল। কেউ কেউ মনে করেন এখানকার লোকেরা সাপ বা নাগের পূজাও করতো।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই যুগে মাতৃকাদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। দেবীর সামনে গন্ধদ্রব্য পোড়ানো হ'তো এবং পশুবলি দেওয়া হ'তো। পুরুষ দেবতার মধ্যে প্রধান ছিলেন ত্রিমুখ পশুপতি যোগীশ্বর বা শিব। এখানে লিঙ্গপূজারও প্রচলন ছিল। এখানকার লোকেরা পশু, গাছ ও জলদেবতার পূজা করতো। সম্ভবতঃ সূর্যপূজা ও নাগপূজারও প্রচলন ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগে সমাজ প্রধানতঃ ধনী ও দরিদ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি শহরে খননকার্যের ফলে যে সব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার থেকে এখানকার সমাজের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জানা যায়। এখানে পাওয়া গেছে পোড়ানো ইটে তৈরী অনেক দোতলা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। এই বাড়িগুলো ছিল বেশ বড় ও আরামপ্রদ। এই বাড়িগুলোতে সুন্দর সুন্দর স্নানাগার ও প্রশস্ত বাসের ঘর ছিল। এই বাড়িগুলোতে চাকর-বাকরের ঘরও ছিল। এর থেকে মনে হয় এখানে যারা বাস করতো তারা ছিল অবস্থাপন্ন ধনী পরিবার।

আবার এই সব শহরে সারিবদ্ধভাবে সাজানো ছোট ছোট দুই ঘরের বস্তিবাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব বাড়িতে বাস করতো শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণী। বড় বড় দোতলা বাড়িগুলোর মধ্যে অনেক সোনা, রূপা ও মূল্যবান পাথরের গহনা, ধাতুর অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি পাওয়া গেছে। আর শ্রমিকদের বাড়িগুলোতে পাওয়া গেছে প্রচুর তামার যন্ত্রপাতি। এর থেকে মনে হয় সমাজে দুটি প্রধান শ্রেণী ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণী আর অপরটি ছিল শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণী।

চীনের কথা

হোয়াং-হো ও ইয়াংসি নদীর কূলে : এশিয়ার বৃহত্তম দেশ চীন। এর পূর্ব দিকে আছে প্রশান্ত মহাসাগর। এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে এই বিশাল দেশেও অতি প্রাচীন কালে এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতার ধারা এখনও অব্যাহত। মেসোপটেমিয়া, মিশর ও ভারতের মত চীনের এই সভ্যতাও গড়ে উঠেছিল বড় বড় নদীর কূলে।

ভূ-প্রকৃতির দিক দিয়ে চীনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। চীনের উত্তর দিকে আছে হোয়াং-হো বা পীত নদের উপত্যকা। এই অংশে আছে চীনের সবচেয়ে বড় সমতলভূমি। এর দক্ষিণে আছে মধ্য চীনের পার্বত্য অঞ্চল ও ইয়াংসি নদীর উপত্যকা। এর দক্ষিণে আছে দক্ষিণ চীনের পার্বত্যভূমি। হোয়াং-হো বা পীত নদের উপত্যকা ও ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় সূচনা হয়েছিল চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতার।

প্রতি বছর পীত নদের বন্যায় চীনের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি উর্বর হয়ে ওঠে। প্রায় তিন হাজার মাইল দীর্ঘ ইয়াংসি নদী চীনের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে শস্যশ্যামল করে তুলেছে। এই দুই নদীর তীরে তাই গড়ে উঠেছে চীনের প্রাচীন সভ্যতা।

প্রাচীন যুগের চীন : প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ইয়াংসি নদীর তীরে এক সভ্যতার সূচনা হয়। এই সময়ে 'ইন' উপজাতির চেষ্টায় ঐ অঞ্চলের সমস্ত উপজাতিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়। এই ঐক্যবদ্ধ উপজাতিগুলি একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এখানকার রাজবংশের নাম অনুসারে এই রাষ্ট্রের নাম হয় সাং বা সাং-ইন রাষ্ট্র।

এখানে খননকার্যের ফলে পাওয়া গেছে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আছে একটি রাজপ্রাসাদ, একটি মন্দির, অনেক বাড়ি ও কারখানা। প্রায় তিন শ' কবরও এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সাং-ইন রাজ্যের লোকেরা যব, গম, জোয়ার প্রভৃতির চাষ করতো। পরে তারা ধানের চাষও আরম্ভ করে এবং জলসেচের

ব্যবস্থা করে। এই সময়ে এখানকার লোকেরা তুতগাছের চাষ করে গুটিপোকা পুষতে এবং এই গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরি করতে শেখে। এরা কাঠের কাজ ও পাথরের কাজ করতে এবং মাটির পাত্র তৈরি করতে পারতো। ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতিও তারা তৈরি করতো। তারা বিনিময়-প্রথায় ব্যবসা-বাণিজ্যও করতো।

পৌরাণিক কাহিনী : অতি প্রাচীন কাল থেকে চীনে ইতিহাস লেখা হ'তো। এই যুগের ইতিহাসগুলো কিন্তু আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এগুলো ছিল কাল্পনিক—পৌরাণিক কাহিনী। এই পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয় প্যান-কু ছিলেন আদি মানুষ। তার নিঃশ্বাস থেকে হ'লো বাতাস ও মেঘ, তার স্বর থেকে হ'লো বজ্র, তার শিরা থেকে হ'লো নদী আর মাংস থেকে জন্ম হ'লো পৃথিবীর। ঘাস ও গাছ হ'লো তার চুল, তার ঘাম হ'লো বৃষ্টি। তার শরীরের পোকা হ'লো মানুষ জাতি।

প্রথম যুগের রাজারা প্রত্যেকে আঠারো হাজার বছর রাজত্ব করেন। সম্রাট ফু-সি তাঁর রানীর সাহায্যে তাঁর প্রজাদের পশু-পালন, রেশম তৈরি করা, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা দেন। পরবর্তী সম্রাট স্থেন্-নুং কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন করেন।

এর পর স্যান নামে এক সম্রাট পীত নদের বন্যা-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। পরবর্তী সম্রাট য়ু ন'টি পাহাড় কেটে ন'টি হ্রদ তৈরি করেন এবং এইভাবে ন'টি নদীর বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করেন। এইভাবে চীনের প্রাচীন সভ্যতার সূচনা হয়।

নদীমাতৃক সভ্যতাগুলির বৈশিষ্ট্য : পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীনে। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস্ নদীর কূলে গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা। মিশরের সভ্যতা ছিল নীল নদের দান। সিন্ধু নদের কূলে সূচনা হয় সিন্ধু-সভ্যতার, আর হোয়াং-হো ও ইয়াংসি নদীর কূলে শুরু হয় চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতার।

বড় বড় নদীর কূলে এই সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল। প্রতি বছর এই নদীগুলিতে বন্যা হ'তো। এই বন্যার ফলে এখানকার

ভূমি ছিল উর্বর। ফলে, এই সব জায়গায় কৃষিকার্যের প্রচুর সুবিধা ছিল এবং এই সব অঞ্চলে কৃষিপ্রধান সভ্যতা গড়ে ওঠে।

কৃষিকার্যের জন্য সব জায়গায়ই প্রায় একই ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। প্রত্যেক অঞ্চলে প্রায় একই শস্যের চাষ হ'তো। প্রত্যেক অঞ্চলে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির জন্য একই ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হ'তো। মাটির পাত্র তৈরির জন্য ব্যবহার করা হ'তো একই ধরনের কুমোরের চাকা। তামা ও টিন মিশিয়ে একই ভাবে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হ'তো। কিন্তু এইসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে তারা যে জিনিসগুলো তৈরি করতো, সেগুলো সব সময়ে এক রকম হ'তো না।

উর্বর জমিতে কৃষিকার্যের ফলে প্রয়োজনের চেয়েও বেশী ফসল উৎপন্ন হ'তো। এই ফসল বাড়াবার জন্য প্রায় একই ধরনের সেচ-ব্যবস্থা ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার প্রচলন হয়। এই অতিরিক্ত ফসল শহরে এনে জমিয়ে রাখা হ'তো। সুতরাং সমস্ত অঞ্চলেই বড় বড় সুরক্ষিত শহর গড়ে ওঠে।

মেসোপটেমিয়ার কিস্ ও আক্কাদ, মিশরের মেম্ফিস, ভারতের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা এবং চীনে ইয়াংসি নদীর তীরে যে সব শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। শহরগুলোতে নানা ধরনের পেশার প্রচলন হয়। তার ফলে এখানে মাটির পাত্রের কাজ করার জন্য কুমোরের, ধাতুর কাজ করার জন্য কামারের, কাঠের কাজ করার জন্য ছুতোরের প্রয়োজন হয়। এইভাবে বিভিন্ন পেশার কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

কিন্তু অতিরিক্ত শস্য যাদের হাতে জমা হ'তো সেই জমিদার শ্রেণী ক্রমে ধনী হয়ে ওঠে। তারা দূর দেশ থেকে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি করতো এবং যে সব তাদের দেশে বেশী তৈরি হ'তো তা অন্য দেশে রপ্তানি করতো। এইভাবে তারা প্রচুর ধনসঞ্চয় করতো। শহরগুলোতে তারা বড় বড় বাড়িতে বাস করতো। তাদের অনেক চাকর বা দাস থাকতো। তাদের বাড়িগুলোতে প্রচুর বিলাসিতার জিনিস পাওয়া গেছে। অপর-পক্ষে শ্রমিক ও কারিগরদের বাড়িগুলো ছিল ছোট। এখানে

যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কোন জিনিস বিশেষ পাওয়া যায়নি। মেসোপটেমিয়া থেকে আরম্ভ করে চীন পর্যন্ত এই সময়ে সর্বত্র সমাজে ধনী ও দরিদ্রের এই শ্রেণীবিভাগ দেখতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে মেসোপটেমিয়া থেকে চীন পর্যন্ত লোকেরা প্রায় একই ভাবে কৃষিকার্য করতো ও প্রায় একই রকম ফসল উৎপন্ন করতো। অতিরিক্ত ফসল শহরে এনে জমাতো, ফলে সব অঞ্চলেই বড় বড় শহর গড়ে ওঠে। একই ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে তারা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতো।

প্রত্যেক অঞ্চলেই ধীরে ধীরে শক্তিশালী রাজা বা শাসকের উদ্ভব ঘটে। অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে ধনিক শ্রেণীও গড়ে ওঠে। এই ধনিক শ্রেণী আবার ব্যবসা-বাণিজ্য করে আরও বেশী ধনসঞ্চয় করে। ফলে, সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয়। একদিকে থাকে ধনিক শ্রেণী, অপরদিকে থাকে শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণী।

মেসোপটেমিয়া, মিশর ও ভারতের লোকেরা লিখতে জানতো। তারা সকলেই চিত্রলিপি ব্যবহার করতো। যদিও এক অঞ্চলের চিত্রলিপির সাথে আর এক অঞ্চলের চিত্রলিপির সাদৃশ্য ছিল না, তবুও সব জায়গায়ই চিত্রলিপির প্রচলন হয়েছিল। এই সব অঞ্চলের ধর্মের মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য ছিল। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রায় একই সময়ের নদীমাতৃক সভ্যতাগুলিতে প্রায় একই ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমান ছিল।

অনুশীলনী

(ক) প্রবন্ধাকারে উত্তর দাও ঃ

১। কোন্ অঞ্চলে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা গড়ে ওঠে? এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ দাও।

২। মেসোপটেমিয়ার সেচব্যবস্থা ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কি জান?

৩। মেসোপটেমিয়ার লোকের নানা ধরনের পেশা সম্বন্ধে কি জান?

৪। সুমেরীয় সভ্যতার বিবরণ দাও।

৫। মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয় কেন?

৬। মিশরের সম্রাট বা ফ্যারাও-এর কাজ ও ক্ষমতার বিষয় কি জান?

৭। মিশরের পুরোহিতদের সম্বন্ধে কি জান?

৮। মিশরের পিরামিড সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৯। মিশরীয়দের ধর্ম সম্বন্ধে কি জান ?

১০। কিভাবে আমরা সিন্ধু-সভ্যতা সম্বন্ধে জানতে পারি ? এই সভ্যতা কোন্ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল ?

১১। সিন্ধু-সভ্যতার যুগের শহরগুলির বিবরণ দাও।

১২। সিন্ধু-সভ্যতার যুগের লোকের খাবার, পোশাক, গহনা প্রভৃতি সম্বন্ধে কি জান ?

১৩। সিন্ধু-সভ্যতার যুগের প্রধান শিল্পগুলির বিবরণ দাও।

১৪। সিন্ধু-সভ্যতার যুগের লোকেদের ধর্ম সম্বন্ধে কি জান ?

১৫। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কি জান ?

১৬। প্রাচীন যুগের চীনের সভ্যতা সম্বন্ধে কি জান ?

১৭। নদী-মাতৃক সভ্যতাগুলির মধ্যে সাদৃশ্যের বিবরণ দাও।

(খ) অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। সুমের কোথায় ? এখানকার কয়েকটি প্রাচীন শহরের নাম কর।

২। সুমেরের মন্দিরগুলি কেমন ছিল ?

৩। মিশরে কিভাবে 'নোম' গঠিত হয় ?

৪। 'হায়রোগ্লিপ্‌স' কাকে বলে ?

৫। 'মমি' কাকে বলে ?

৬। সিন্ধু-সভ্যতার যুগের লোকেরা কোন্ কোন্ দেশের সাথে বাণিজ্য করতো ?

৭। চীনের প্রাচীন সভ্যতা কোন্ কোন্ নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ?

(গ) এক কথায় উত্তর দাও :

১। মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম কি ?

২। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা গড়ে তুলেছিল কারা ?

৩। কারা সর্বপ্রথম সোনা ও রূপাকে মূল্যমান হিসাবে গ্রহণ করে ?

৪। যে রাজা মিশরকে সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ করেন তাঁর নাম কি ?

৫। মিশরে সবচেয়ে বড় পিরামিড কে তৈরি করেন ?

৬। মিশরীয়দের মধ্যে যারা গ্রামে বাস করতো তাদের কি পেশা ছিল ?

৭। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে কোথায় পোতাশ্রয় ছিল বলে জানা গেছে ?

৮। চীনের প্রথম রাষ্ট্রের নাম কি ?

৯। চীনের পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে আদি মানুষ কে ছিলেন ?

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহ যুগের সমাজ

লৌহের আবিষ্কার ও ব্যবহার—ফল : তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের শেষে লৌহ যুগের সূচনা হয়। তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ফলে এক নব যুগের সূচনা হয়। কিন্তু তামা ও টিন সহজলভ্য ছিল না। তাদের দামও ছিল বেশী। সুতরাং বহু লোকের পক্ষে এইগুলি ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। তামা ও ব্রোঞ্জের চেয়ে শক্ত ধাতুতে অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তামা ও টিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেতো না, কিন্তু লোহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আকরিক লোহা থেকে যন্ত্রপাতি তৈরি করাও কঠিন নয়। সুতরাং ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি লোহার যন্ত্রপাতির প্রচলন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে লৌহ যুগের সূচনা হয়।

উল্কাপাতের ফলে যে লোহা পাওয়া যেতো মানুষ সম্ভবতঃ প্রথমে তাই দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে। পরে তারা আগুনের সাহায্যে আকরিক লোহা গলিয়ে যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে আরম্ভ করে। উত্তর রোডেসিয়ায় চার হাজার বছরের পুরানো এক লোহার কারখানার সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্রমে সহজে ও অল্প খরচে লোহার অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরি করা শুরু হয়। এর ফলে সমাজজীবনে বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা হয়।

লোহার যন্ত্রপাতি ছিল সস্তা। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে এই যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা ছিল সহজ। তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতির চেয়ে লোহার যন্ত্রপাতি ছিল শক্ত ও উন্নত ধরনের। সুতরাং যে-কোন কৃষক বা কারিগর আরও ভালভাবে নিজের কাজ করতে পারতো। যন্ত্রপাতির জন্য তাকে ধনীদের উপর নির্ভর করতে হ'তো না। লোহার ব্যবহারের ফলে শিল্পের উন্নতি ঘটে। সস্তায় উন্নত ধরনের গাড়ি ও জাহাজ তৈরি সম্ভব হয়। সুতরাং যাতায়াত ব্যবস্থারও উন্নতি হয়।

এতদিন ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্রের উপর সভ্য জাতিগুলির একচেটিয়া অধিকার ছিল। সভ্য জাতিগুলির মধ্যেও একমাত্র ধনীরাই এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারতো। কারণ এগুলি ছিল দুর্মূল্য।

কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সস্তা লোহার অস্ত্রশস্ত্রের প্রচলনের ফলে সভ্য জাতিগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বিপন্ন হয়। লোহার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যে-কোন সাধারণ লোক ব্রোঞ্জ যুগের সৈনিকদের সম্মুখীন হতে পারতো।

সুতরাং লোহার প্রচলনের ফলে ধাতুর যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র সহজলভ্য হয়। সাধারণ লোকেদের আর যন্ত্রপাতির জন্য ধনীদের উপর নির্ভর করতে হ'তো না। ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতির চেয়ে লোহার যন্ত্রপাতি শক্ত ও উন্নত ধরনের ছিল। সুতরাং কৃষিকার্য, শিল্প ও যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। লোহার অস্ত্রশস্ত্র প্রচলনের ফলে ব্রোঞ্জ যুগের সৈনিকদের প্রাধান্যও নষ্ট হয়।

লৌহ যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন: লৌহ যুগে সমাজে বড় রকমের পরিবর্তন আসে। ব্রোঞ্জ যুগে ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতির দাম ছিল বেশী। সাধারণ কৃষক বা কারিগরের পক্ষে ঐ সব যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব ছিল না। ফলে, কৃষক বা কারিগরকে যন্ত্রপাতির মালিক ধনী ব্যক্তিদের অধীনে কাজ করতে হ'তো। কিন্তু লোহার যন্ত্রপাতি ছিল সস্তা। সাধারণ কৃষকের পক্ষে একখানা কুড়ুল বা একটা লাঙ্গলের ফলা সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না। এই কুড়ুলের সাহায্যে সে বন কেটে নতুন জমি তৈরি করতে পারতো। লোহার ফলার লাঙ্গল দিয়ে সে পাথুরে জমিও চাষ করতে পারতো। আবার কারিগরও তার কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগাড় করে ধনীর কবল থেকে মুক্ত হতে পারতো। এক কথায়, লৌহ যুগে পুরানো ধনিক শ্রেণীর প্রভুত্ব কমে যায় এবং সাধারণ লোকের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়। লোহার অস্ত্রশস্ত্রের প্রচলনের ফলে ব্রোঞ্জ যুগের যুদ্ধব্যবসায়ীদের প্রাধান্য কমে যায়। লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্রোঞ্জের অস্ত্রের চেয়ে সস্তা। অসভ্য জাতিগুলিও ক্রমে এই অস্ত্রের ব্যবহার শেখে। ফলে, এদের হাতেই ব্রোঞ্জ যুগের বড় বড় রাজ্যগুলির পতন ঘটে।

রাজতন্ত্রের উদ্ভব: যন্ত্রপাতির বহুল প্রচলন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব এবং দাসত্ব প্রথার প্রসারের ফলে সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয়। এক শ্রেণীর লোক হয়ে দাঁড়ায় জমির মালিক আর যন্ত্রপাতির অধিকারী। এরা নিজেরা কাজ করতো না। অপর শ্রেণীর

লোকেদের জমি বা যন্ত্রপাতি ছিল না। এরা জমির মালিক ও যন্ত্রপাতির অধিকারীদের জন্য কাজ করতো।

যারা সম্পত্তির মালিক তারা অন্যদের অধীনে রাখার জন্য চেষ্টা করতো। এই উদ্দেশ্যে তারা একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এই প্রতিষ্ঠানের নামই রাষ্ট্র। সেনাবাহিনী, বিচারালয়, কারাগার প্রভৃতি ছিল এই প্রতিষ্ঠানেরই অঙ্গ।

রাষ্ট্রের উদ্ভবের একটা প্রধান কারণ যুদ্ধবিগ্রহ। যুদ্ধের সময়ে একজন নেতার প্রয়োজন হয়। কালক্রমে এই নেতার হাতে অনেক বেশী ক্ষমতা আসে। ফলে, এই নেতাই রাজা হয়ে দাঁড়ায়। যারা সম্পত্তির মালিক তারা নিজেদের স্বার্থেই রাজার সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এই যুগে পুরোহিতদেরও সমাজে খুব প্রভাব ছিল। মন্দিরগুলির অনেক সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ছিল পুরোহিতগণ। সুতরাং পুরোহিতগণও রাজার সমর্থক হয়ে ওঠে। রাজাও নিজের স্বার্থে সম্পত্তির মালিক ও পুরোহিতদের স্বার্থ রক্ষা করেন। এইভাবে রাজতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

লৌহ যুগে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। ফলে, এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের বিবাদও বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধবিগ্রহ বাড়ার সাথে সাথে রাজার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এইভাবে লৌহ যুগে শক্তিশালী রাজশক্তি গড়ে ওঠে।

ব্যাবিলন

মেসোপটেমিয়ার দুই প্রধান অংশ—আক্কাদ্ ও সুমের। প্রায় চার হাজার বছর আগে অ্যামোরাইটরা আক্কাদ ও এলামাইটরা সুমের আক্রমণ করে। অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত মেসোপটেমিয়াই তাদের অধিকারে আসে। তারপর অ্যামোরাইটদের সাথে এলামাইটদের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধের ফলে অ্যামোরাইটরা জয়লাভ করে এবং ব্যাবিলন শহরের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে যে শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠে, তার প্রথম দিককার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজার নাম হামুরাবি। তিনি আনুমানিক ১৯৪৮ হতে ১৯০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হামুরাবি এলামাইটদের

পরাজিত করেন, ব্যাবিলনের উত্তরে মারিরাজ্য জয় করেন এবং অসুর নামক শহর অধিকার করেন।

হামুরাবি শুধু বিজয়ী বীর ছিলেন না, আইন-প্রণেতা হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। হামুরাবির আইন থেকে এই যুগের সমাজের অনেক বিষয় জানা যায়।

কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য: এই যুগে ব্যাবিলনে অধিকাংশ জমির মালিক ছিল জমিদারগণ। প্রজা ও দাসরাই এই জমি চাষ করতো। কিছু কৃষকও ছোট ছোট জমির মালিক ছিল। বলদে-টানা লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা হ'তো। লাঙ্গলের সাথে লাগানো একটা নলের সাহায্যে বীজ বোনা হ'তো। ক্ষেতখামারগুলোকে বাঁধ দিয়ে বন্যা থেকে রক্ষা করা হ'তো। নদীর বাড়তি জল খাল কেটে দূরে দূরে ছড়িয়ে দেওয়া হ'তো। জলাধারে এই জল জমিয়ে রাখারও ব্যবস্থা ছিল।

এইভাবে জলসেচের ফলে জমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হ'তো। ফলের বাগানে নানাবিধ ফল, বিশেষ করে, প্রচুর খেজুর জন্মাতো। এই সব বাগানে প্রচুর আঙ্গুর ও জলপাই পাওয়া যেতো। ক্ষেত-খামারে গবাদি পশু থাকতো। ব্যাবিলনে তাই দুধের অভাব ছিল না।

ব্রোঞ্জ ও লোহা দিয়ে যন্ত্রপাতি বানানো হ'তো। তুলো ও পশমের কাপড় বোনা হ'তো। কাপড় রং করারও ব্যবস্থা ছিল। ইঁট পোড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে।

বাণিজ্য চলতো জলপথে ও স্থলপথে। চাকা-লাগানো গাধায়-টানা গাড়ির সাহায্যে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মাল বয়ে নেওয়া হ'তো। নেবুচেদ্‌রেজার নামে ব্যাবিলনের এক সম্রাট রাস্তা-ঘাটের উন্নতি করেন। স্থলপথে ভারত, মিশর, প্যালেষ্টাইন, এশিয়া-মাইনর প্রভৃতি জায়গা থেকে অনেক জিনিস আসতো ব্যাবিলনের বাজারে। আবার নেবুচেদ্‌রেজার ইউফ্রেটিস্ নদীতে নৌ-চলাচল ব্যবস্থারও উন্নতি করেন। বড় বড় জাহাজে সমুদ্রপথেও বাণিজ্য করা হ'তো। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা ও বিপদও ছিল।

যে-অঞ্চলের মধ্য দিয়ে স্থলপথে মাল নিয়ে যাওয়া হ'তো, সেখানে খুব বেশী শুল্ক আদায় করা হ'তো। পথে দস্যুর ভয়ও ছিল। সমুদ্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকায় প্রায়ই বিপদ ঘটতো, প্রায়ই চড়ায় জাহাজ আটকে যেতো। আবার সমুদ্রে জলদস্যুরও ভয় ছিল।

সোনা ও রূপার মাধ্যমে ও বিনিময় প্রথায় বাণিজ্য চলতো। ব্যবসায়ীদের মধ্যে উচ্চ সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা ছিল। বাজারে ব্যাপকভাবে দাস কেনা-বেচা হ'তো। শারীরিক পরিশ্রমের কাজ প্রধানতঃ দাসরাই করতো। বাড়ির ঝি-চাকরের কাজও তারা করতো। দাসরা ছিল তাদের মালিকের সম্পত্তি।

মন্দির ও পুরোহিত : ব্যাবিলনের সমাজে ধর্মের গুরুত্ব ছিল সব চেয়ে বেশী। রাজারা দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য বড় বড় মন্দির তৈরি করতেন। এই মন্দিরের ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁরা বড় বড় জমি দান করতেন এবং সরকার থেকে নিয়মিত অর্থদানের ব্যবস্থা করতেন। যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক অংশ পেতো মন্দির। সাধারণ লোকও সাধ্যমতো মন্দিরে অর্থ দান করতো। ফলে, মন্দিরে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হ'তো। পুরোহিতরা এই অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটাতো, তারা লোককে এই অর্থ ধার দিতো। এইভাবে মন্দিরগুলো সবচেয়ে ধনী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সমাজে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হয় সব চেয়ে বেশী। পুরোহিতের দ্বারা অভিষিক্ত না হ'লে কোন রাজাই জনসাধারণের কাছে প্রকৃত রাজা বলে গণ্য হ'তো না। বিচার-আচার প্রভৃতি অনেক কাজই পুরোহিতরা করতো। তাদের ক্ষমতা রাজার চেয়ে কম ছিল না। কখনও কখনও তারা রাজাকে পদচ্যুতও করতো।

ব্যাবিলনে দেবতার সংখ্যা কত ছিল বলা কঠিন। এক বিবরণে জানা যায় যে, এদের সংখ্যা ছিল ৬৫,০০০। এই দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—মার্দুক, সামস, ওমুজ ও ইসতর। প্রত্যেক শহরের বিশেষ দেবতা থাকতো। মৃতের আত্মাকেও পূজা করা হ'তো। নদী ও খালেরও দেবতা ছিল। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই দেবতাদের ও তাদের পুরোহিতদের প্রভাবই ছিল প্রধান।

ব্যাবিলনে এই সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটে। এখানে কিউনিফর্ম লিপির প্রচলন হয়। এই যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বই "গিলগ্যামেসের মহাকাব্য"। চিত্রশিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতিতেও ব্যাবিলনের অধিবাসীরা পারদর্শী ছিল। এই যুগে ব্যাবিলনে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতিরও উন্নতি ঘটে।

হামুরাবির আইন : হামুরাবির রাজত্বকালে ব্যাবিলন একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। এই রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য হামুরারি বিধিবদ্ধ আইন রচনা করেন। একটা স্তম্ভের গায়ে এই আইনগুলি খোদিত করা হয়। আইনগুলির সংখ্যা ছিল মোট ২৮৫। হামুরাবি ঘোষণা করেন এই আইন তিনি পেয়েছেন দেবতাদের কাছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার, শ্রম প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় নিয়ে এই আইনগুলি রচিত।

ফৌজদারী আইনের মূল কথা ছিল সমুচিত প্রতিশোধ—অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। পরে শারীরিক শাস্তির বদলে অর্থদণ্ডেরও ব্যবস্থা হয়। কতকগুলো অপরাধে মৃত্যুদণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল। এই আইনে কিছু কিছু পণ্যের মূল্য ও মজুরী নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

হামুরাবির আইনে এই সময়ের সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে। সমাজের প্রধান ছিল জমিদার, পুরোহিত ও ব্যবসায়িগণ। এদের স্বার্থ ও সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন থেকে ব্যাবিলনে দাসদের অবস্থার কথাও জানা যায়। এই আইন থেকে জানা যায় যে, ব্যাবিলনে কৃষিকার্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। এই আইন থেকে জানা যায়, ব্যাবিলনে নানা শিল্পের প্রচলন ছিল। এর মধ্যে মাটির পাত্র নির্মাণ, চর্মশিল্প, পোশাক প্রস্তুত, লোহার কাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই আইনে উচ্চশ্রেণীর লোককে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। একজন সাধারণ লোককে আঘাত করলে যে জরিমানা হ'তো, একজন উচ্চ শ্রেণীর ধনীকে আঘাত করলে তার ছয়গুণ বেশী জরিমানা দিতে হ'তো। সমাজে যে জমিদার, ব্যবসায়ী ও পুরোহিতদের প্রাধান্য ছিল, এই আইনগুলি থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়।

মিশরীয় সাম্রাজ্য

উপনিবেশসমূহ : খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মিশর দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময়ে হিক্‌সস্ নামে এশিয়ার এক যাযাবর জাতি মিশর অধিকার করে। প্রায় দু'শো বছর এরা মিশর শাসন করে। প্রায় দু'শো বছর পরাধীনতার পর মিশরীয়রা হিক্‌সস্‌দের বিতাড়িত করে। যে রাজবংশের নেতৃত্বে মিশর আবার স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ হয়, তার নাম অষ্টাদশ রাজবংশ। অষ্টাদশ রাজবংশের নেতৃত্বে মিশরের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। এই যুগকে বলা হয় মিশরের নতুন রাজ্যের যুগ।

মিশরের প্রাধান্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় থাটমোস্। তিনি ১৫২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৪৯১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং একটি নৌবাহিনী গঠন করেন। এই দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে অন্ততঃ পনরোবার অভিযান করেন এবং সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, লিবিয়া এবং ন্যুবিয়া দখল করেন। সমস্ত ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চল তাঁর অধীনে আসে। এইভাবে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন।

থাটমোস্ শুধু রাজ্য জয় করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। এগুলির শাসনেরও তিনি ব্যবস্থা করেন। দূরবর্তী দেশগুলি যাতে মিশরের হাতাছাড়া না হয়, সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। এগুলিকে তিনি উপনিবেশে পরিণত করেন। প্রত্যেক দূরবর্তী বিজিত দেশে তিনি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী রেখে আসেন। সেখানে যোগ্য শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। এই শাসনকর্তারা এই দেশগুলিকে সম্রাটের নামে শাসন করে এবং এখান থেকে অর্থ দেশে পাঠায়। এই উপনিবেশগুলির অর্থে মিশর সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

পুরোহিতদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি : মিশরে ধর্মের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশী। ফ্যারাও বা রাজা নিজেকে বলতেন দেবতার পুত্র। রাজাই ছিলেন প্রধান পুরোহিত। সুতরাং পুরোহিতদের প্রভাব ছিল খুব বেশী। পুরোহিতরাই ছিল রাজার প্রধান সমর্থক। পুরোহিতের ছেলেরাই সাধারণতঃ পুরোহিত হ'তো।

রাজা এদের মুক্তহস্তে জমি ও অর্থ দান করতেন। জনসাধারণও এদের সাধ্যমত অর্থ দিতো। এইভাবে পুরোহিতরা একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। দেবতাদের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস, ভয় ও ভক্তির অন্ত ছিল না। সেই দেবতাদের প্রতিনিধি ও পূজারী ছিল পুরোহিতরা। সুতরাং, জনসাধারণও পুরোহিতদের যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করতো।

তৃতীয় থাটমোস্‌ ও অন্যান্য রাজারা অনেক দেশ জয় করেন। এই সব দেশ থেকে তাঁরা প্রচুর অর্থ, দাস ও গবাদি পশু নিয়ে আসেন। রাজারা মন্দিরগুলোকে এবং পুরোহিতদের এই সমস্ত সম্পদের একটা বড় অংশ দান করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, রাজধানী থিবসের প্রধান দেবতা অ্যামন-রার মন্দিরকে সমগ্র লেবানন ও তিনটি শহরের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়।

এইভাবে দেশে পুরোহিতদের ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মন্দিরগুলোর মধ্যে অ্যামন-রার মন্দিরই সব চেয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। অন্য সমস্ত মন্দিরের মোট যত জমি ও দাস ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল একমাত্র অ্যামন-রার মন্দিরের। সুতরাং থিবসের পুরোহিতদের ক্ষমতা খুবই বৃদ্ধি পায়। এমন কি, তারা সম্রাটের কিছু ক্ষমতাও কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। মিশরে পুরোহিতরা রাজার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়।

ইরাণ

পারস্যের উত্থান : পারস্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে ছিল ইরাণ উপত্যকা। মেসোপটেমিয়ার পূর্বে অবস্থিত এই উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে সোনা, রূপা, লোহা ও সীসা পাওয়া যেতো। এখানে রাই, গম ও যবের চাষ হ'তো।

অতি প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ ক্যাস্‌পিয়ান সমুদ্রের উপকূল থেকে কয়েকটি ইরাণী উপজাতি এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। তাদের নাম অনুসারেই এই অঞ্চলের নাম হয় ইরাণ। খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকে এই ইরাণী উপজাতিগুলি মিডিস ও পারসীক এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

প্রথমে মিডিয়া শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সাইরাস্ মিডিয়ার অযোগ্য রাজাকে হারিয়ে মিডিয়া জয় করেন। সাইরাস্ ছিলেন পারসীকদের এক নেতা। তিনি পারস্যের বিখ্যাত অ্যাকিমেনিড্ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

সাইরাস্ পারস্যের সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করেন। তার পর তিনি অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন, লিডিয়া ও এশিয়া-মাইনর জয় করেন। প্যালেষ্টাইন ও ফিনিশিয়াও তাঁর অধিকারে আসে। তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এক উপজাতির সাথে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাইরাস্ পরাজিত শত্রুর প্রতি উদার ব্যবহার করতেন। পরাজিত দেশের দেবদেবীর প্রতি তিনি শ্রদ্ধা দেখাতেন। তাদের ধর্মবিশ্বাসে তিনি আঘাত দিতেন না। ফলে, পরাজিত জাতিগুলি সহজেই তাঁর শাসন মেনে নিত। এইভাবে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করেন।

সাইরাসের পুত্র ক্যাম্বাইসেস্ মিশর জয় করেন। তিনি সাইরাসের নীতি পরিত্যাগ করেন এবং মিশরীয়দের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন ও তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেন। ক্যাম্বাইসেসের রাজত্বের শেষের দিকে অরাজকতা দেখা দেয়। এই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে পারস্য সাম্রাজ্যকে আবার শক্তিশালী করে তোলেন প্রথম দরায়ুস্।

দরায়ুসের সিংহাসন লাভের আগে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি বিদ্রোহ করে। দরায়ুস্ এই বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি দক্ষিণ রাশিয়ায় অভিযান পরিচালনা করেন। তারপর তিনি আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং সিন্ধু নদের উপত্যকায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি গ্রীস দেশেও অভিযান প্রেরণ করেন কিন্তু তাঁর বাহিনী গ্রীকদের হাতে ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাজিত হয়।

দরায়ুস্ শুধু বিভিন্ন দেশ জয় করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি এক শক্তিশালা শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। রাজার ক্ষমতা ছিল অসীম। তাঁর উপাধি ছিল রাজাধিরাজ। বিশাল সাম্রাজ্য

অনেকগুলি প্রদেশ বা 'স্যাটরাপি'-তে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিজিত দেশ এক-একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এই প্রদেশগুলির শাসনকর্তাদের 'স্যাটরাপ্' বলা হ'তো। রাজা তাদের নিযুক্ত করতেন। তারা রাজার কাছে নিয়মিত কর পাঠাতো।

দরায়ুস্ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের জন্য সর্বত্র এক ধরনের মুদ্রার প্রচলন করেন। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অনেক রাস্তা নির্মাণ করা হয় এবং মাঝে মাঝে সরাইখানা নির্মাণ করা হয়। দরায়ুস্ সৈন্যবিভাগেরও সংস্কার করেন। ফলে, সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী হয়।

জোরো অষ্টার বা জরাথুষ্ট্র: পারস্যের প্রাচীন কাহিনী থেকে জোরো অষ্টারের জীবনকাহিনী জানা যায়। দেবতার অনুগ্রহে এক পুরোহিতের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। জন্মের পরই তিনি উচ্চহাস্য করে ওঠেন। ফলে, অপদেবতারা তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। জ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। তিনি মানুষের সমাজের বাইরে এক নির্জন পর্বতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন। শয়তান তাঁকে লোভ দেখায়। কিন্তু তাতে তাঁর মন টলে না। তাঁর উপর নানা রকম নির্যাতন করা হয়। কিন্তু আলোর দেবতা 'আহুর মাজদা'র উপর তাঁর বিশ্বাস অটল থাকে। তখন আহুর মাজদা তাঁকে দেখা দেন এবং তাঁর হাতে তুলে দেন 'আবেস্তা' বা জ্ঞানের বই। আহুর মাজদা তাঁকে ওই জ্ঞান মানুষের সমাজে প্রচার করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে তাঁর ভাগ্যে জোটে বিদ্রূপ ও নির্যাতন। পরে ইরাণের এক রাজা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে ঐ মত প্রচার করেন। বৃদ্ধ বয়সে বজ্রাঘাতে তাঁর দেহাবসান ঘটে এবং তিনি স্বর্গে যান।

জোরো অষ্টার যখন তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন, মিডিস্ ও পারসীকদের মধ্যে তখন নানা দেবদেবী, পশু ও পূর্বপুরুষদের পূজার প্রচলন ছিল। তাদের পুরোহিতকে বলা হ'তো 'মাগি'। এদের মতের বিরুদ্ধে জোরো অষ্টার প্রচার করেন যে, ঈশ্বর এক—তিনি আহুর মাজদা বা আলোর দেবতা। পারস্যরাজ প্রথম দরায়ুস্ তাঁর মত গ্রহণ করেন। জোরো অষ্টারের প্রচারিত ধর্মই হয় রাজধর্ম।

জোরো অষ্টারের প্রচারিত ধর্মের সমস্ত কথাই 'আবেস্তা' নামক ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে। আলোর দেবতা 'আহুর মাজদা' ছিলেন সাতটি গুণের আধার। পরবর্তী কালে এই সাতটি গুণকে সাতটি দেবদূত বলে মনে করা হ'তো। এই সাতটি গুণকে ধ্বংস করার জন্য ছিল সাতটি অপদেবতা। এদের নেতা ছিল অ্যারিম্যান। আহুর মাজদা ও তাঁর সাতটি দেবদূতের সাথে অ্যারিম্যান ও তার অপদেবতার যুদ্ধ চলছে। সমস্ত সৎ লোক শেষ পর্যন্ত আহুর মাজদার সাথে স্বর্গে স্থান পাবে আর সমস্ত অসৎ লোক অন্ধকারের সমুদ্রে পতিত হবে।

জোরো অষ্টারের মতে মানুষ স্বাধীন চিন্তা ও ইচ্ছার অধিকারী। তারা ইচ্ছামত আহুর মাজদা বা অ্যারিম্যানের পক্ষে যোগ দিতে পারে।

জোরো অষ্টারের মতে শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করা, অধার্মিককে ধার্মিকে পরিণত করা এবং অজ্ঞানকে জ্ঞানদান করাই মানুষের কর্তব্য। ধার্মিকতা, কার্যে ও কথায় সততা এবং সম্মানবোধই মানুষের প্রধান গুণ। অবিশ্বাসই সব চেয়ে বড় পাপ। জোরো অষ্টার মন্দির নির্মাণ বা মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। পবিত্রভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। আগুনকে পূজা করা হ'তো দেবতারূপে। প্রত্যেক বাড়িতে আগুন রাখা হ'তো। এই আগুনকে কখনও নিভতে দেওয়া হ'তো না। যারা জোরো অষ্টারের ধর্মমত মানতো, তারা মৃতদেহ পোড়াতো না বা কবর দিতো না। জন্তু-জানোয়ারের আহারের জন্য এগুলো খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হ'তো।

ইহুদীদের কথা

হিব্রুদের মিশরে আগমন: লেবাননের দক্ষিণ দিকের পার্বত্য ভূমির পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে আরব মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল প্রাচীন প্যালেষ্টাইন। এর পশ্চিমে ছিল ভূমধ্যসাগর। প্রাচীন কালে এই দেশ ছিল উর্বর। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হ'তো।

এই বৃষ্টির জল বড় বড় জলাধারে জমিয়ে রাখা হ'তো। বহুসংখ্যক খালের সাহায্যে এই জল সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হ'তো। ফলে, এখানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হ'তো। এখানে অনেক রকম ফলের গাছও ছিল।

ইহুদীদের বিশ্বাস তারা সুমেরিয়া থেকে এসে প্যালেষ্টাইনে বসবাস আরম্ভ করে। প্যালেষ্টাইন থেকে ইহুদীরা মিশরে আসে। কি ভাবে তারা মিশরে আসে তা জানা যায় না। মিশরের এক সম্রাটের বিজয়স্তম্ভের লিপি থেকে জানা যায় যে, মিশর প্যালেষ্টাইন জয় করেছিল। কিন্তু প্যালেষ্টাইন থেকে সমস্ত ইহুদীদের তাড়িয়ে মিশরে আনা হয়েছিল এ রকম কোন কথা ঐ লিপিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ অল্পসংখ্যক ইহুদী প্রথমে মিশরে আসে। পরে তাদের সংখ্যা নানা কারণে বেড়ে যায়। মিশরীয়রা ইহুদীদের দাসে পরিণত করে। তাদের বড় বড় নির্মাণকার্যে নিয়োগ করা হয়। যা হোক্, ইহুদীরা মিশরে দাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। এই অবস্থা থেকে তারা মুক্তি পাবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল।

দাসত্ব থেকে পলায়ন ও মুক্তি : মিশরে ইহুদীরা যে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে বাস করছিল, তার থেকে তাদের মুক্তি দেন তাদের এক নেতা। এই নেতার নাম মোসেস্। মোসেস্ ইহুদীদের সিনাই পর্বতের কাছে নিয়ে আসেন। প্রায় চল্লিশ বছর ইহুদীরা মরুভূমি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। মোসেস্ ইহুদীদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের শাসন করেন। এই সময় থেকেই ইহুদীরা একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়।

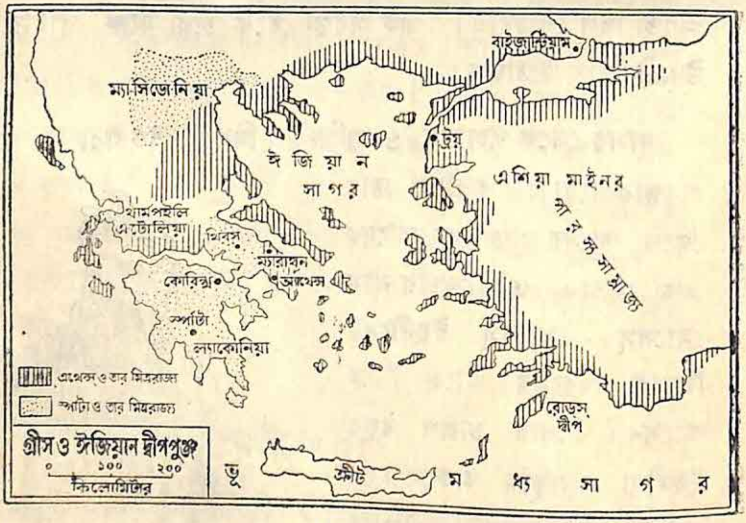


মোসেস্

গ্রীস

গ্রীসের কথা : দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের শেষ সীমায় প্রায় সমুদ্র-বেষ্টিত উপদ্বীপটির নাম গ্রীস। অতি প্রাচীনকালে এখানে এক উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়ে ওঠে। ইরাক, মিশর, ভারত বা চীনের মত এখানকার সভ্যতা কোন বড় নদীর তীরে গড়ে ওঠেনি। এখানকার ভূমিও তত উর্বর নয়। কিন্তু এখানে প্রচুর পরিমাণে লোহা, সোনা, রূপা ও পাথর পাওয়া যেতো। সমুদ্র খুব কাছে হওয়ায় এখানকার অধিবাসীরা জলপথে বাণিজ্য করার সুযোগ পায়। ফলে, অতি প্রাচীনকালেই তারা নানা দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে।

ক্রীটের সভ্যতা ও তার প্রভাব : গ্রীসের পূর্বে আছে ঈজিয়ান সমুদ্র। ঈজিয়ান সমুদ্রে আছে অনেক দ্বীপ। এই দ্বীপগুলিতেও গ্রীকরা বসতি স্থাপন করে। কিন্তু গ্রীকদের গ্রীসে বা এই সমস্ত দ্বীপে আসার আগে দক্ষিণ ঈজিয়ান সমুদ্রের এক বড় দ্বীপে এক



উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই দ্বীপটির নাম ক্রীট। এই দ্বীপের নোসাস্ ও ফেস্‌টাস্ নগর ছিল শক্তিশালী রাজাদের রাজধানী। খ্রীষ্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগে নোসাস্ ও ফেস্‌টাসের রাজবাড়িগুলি তৈরি হয়।

ক্রীটের অধিবাসীরা মিশর প্রভৃতি দেশের সাথে বাণিজ্য করতো। নোসাসের ত্রিতল রাজপ্রাসাদে সুন্দর স্নানঘর ও জলনিকাশের ব্যবস্থা ছিল। ওই প্রাসাদেই ছিল সরকারী দপ্তরখানা। রাজপ্রাসাদের দেওয়ালগুলি সুন্দর ফ্রেস্কো চিত্রে সুশোভিত ছিল। এই সমস্ত চিত্র থেকে এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। এদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অনেকটা আধুনিক ইউরোপীয়ানদের মত। এরা খুব সুন্দর সুন্দর রং করা মাটির পাত্র তৈরি করতো। এরা এক প্রকৃতিদেবীর উপাসক ছিল। এই প্রকৃতিদেবীর সাথে থাকতো এক অধীনস্থ পুরুষ দেবতা। এই দেবদেবীর চিহ্ন ছিল জোড়া-কুড়ুল। এই সময়ের ক্রীটের লোকেরা লিখতে শিখেছিল। কিন্তু তাদের লেখা এখনো পড়া সম্ভব হয়নি। এই সভ্যতার মূলে ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। এই সভ্যতা শুধু ক্রীট দ্বীপেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রীসের উপকূলে মাইসিনিয়া প্রভৃতি স্থানেও প্রায় একই ধরনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতার প্রভাব পরবর্তীকালে গ্রীকদের উপরও পড়ে।

হোমারের যুগ : গ্রীসের দুই বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম ইলিয়াড ও ওডেসী। গ্রীকদের বিশ্বাস, অন্ধ কবি হোমার এই দুই মহাকাব্য রচনা করেন। এই দুই মহাকাব্যে যে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, তা সত্য কি না বলা যায় না। কিন্তু এই দুই মহাকাব্যে প্রাচীন গ্রীকদের আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রার যে ছবি পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক হতে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতক পর্যন্ত গ্রীসে যে ধরনের আচার-ব্যবহার প্রচলিত ছিল তারই বিবরণ পাওয়া যায় এই দুই মহাকাব্যে।


হোমার

হোমারের যুগে গ্রীস বহুসংখ্যক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজা ছিলেন প্রধান পুরোহিত, প্রধান বিচারপতি ও প্রধান সেনাপতি। প্রজাদের চোখে রাজা ছিলেন দেবতার বংশধর। রাজার ছেলেই সাধারণতঃ রাজা হ'তো। কিন্তু অযোগ্য রাজপুত্রকে প্রজারা সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করতে পারতো। রাজার হাতে অনেক ক্ষমতা থাকলেও তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারতেন না। রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সমিতি ছিল। এই সমিতির মতের বিরুদ্ধে রাজার পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া রাজা মাঝে মাঝে সমস্ত স্বাধীন প্রজার এক সভা ডাকতেন। এই সভা রাজার প্রস্তাব শুনতো এবং এই প্রস্তাবে সম্মতি বা অসম্মতি জানাতো। তারা কিছু আলোচনা করতে পারতো না।

হোমারের যুগের প্রথম দিকে পরিবারের ক্ষমতা ছিল বেশী। তখন পরিবারের প্রধানই ছিল পরিবারের সকলের জীবন-মরণের কর্তা। পরে পরিবারের ক্ষমতা কমে ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়ে। কতকগুলি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী এবং কতকগুলি গোষ্ঠী নিয়ে একটি উপজাতি গঠিত হ'তো। রাজার অধীনে কয়েকটি উপজাতি নিয়ে গড়ে উঠতো রাজ্য।

জনসাধারণ মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। অল্প কিছু লোক ছিল বিস্তীর্ণ জমির মালিক। সাধারণ স্বাধীন লোক ছিল ছোট ছোট জমির মালিক। তারা নিজেরাই ঐ জমি চাষ করতো। কিছু লোকের আদৌ জমি ছিল না—তারা জমিদারদের জমিতে কাজ করতো। এ ছাড়া রাজা ও জমিদারদের কিছু কিছু ক্রীতদাস থাকতো। যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হ'তো। জলদস্যুদের কাছ থেকেও দাস কেনা হ'তো। তবে সাধারণতঃ ক্রীতদাসদের বাড়ির কাজেই লাগানো হ'তো এবং এদের উপর সদয় ব্যবহার করা হ'তো।

এই সময়ে জীবনযাত্রা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। রাজা ও জমিদাররা সাধারণের মতই কাজ করতো। জীবিকার প্রধান

উপায় ছিল—চাষবাস ও পশুপালন। ভোজসভায় গান-বাজনার ব্যবস্থা থাকতো। গ্রীকরা বহু দেবদেবীর পূজা করতো।

নগররাষ্ট্রের উদ্ভব : হোমারের যুগের শেষভাগে রাজারা ধীরে ধীরে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াতে থাকেন। রাজার চেষ্টায় এই সময়ে ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে এক-একটি নগরের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে প্রায়ই এক রাজ্য অন্য রাজ্যকে আক্রমণ করতো। তাই সাধারণ লোক রাজার দুর্গের পাশে থাকতে আগ্রহী ছিল। রাজারাও অনেক সময়ে প্রজাদের নগরে এসে বাস করবার জন্য চাপ দিতেন। কখনও কখনও কতকগুলি গ্রামের চারপাশে পাঁচিল দিয়ে নগর গড়ে তোলা হ'তো।

হোমারের যুগে গ্রীসে অনেক ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু তারা সকলেই নিজেদের একজাতি বলে মনে করতো। তারা সকলেই একই দেবদেবীর পূজা করতো ; একই মন্দির থেকে দৈববাণী শুনতো। জাতীয় ক্রীড়া-মঞ্চগুলিতে শুধু গ্রীকরাই অংশগ্রহণ করতো। বিদেশীদের এখানে স্থান ছিল না। তারা সকলে একই ভাষায় কথা বলতো। বিভিন্ন রাজ্যের গ্রীকদের আচার-ব্যবহারের মধ্যেও মিল ছিল। এইভাবে সমস্ত গ্রীকদের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য গড়ে ওঠে।

উপনিবেশ স্থাপন : প্রাচীন কালে গ্রীকরা গ্রীসের বাইরে নানা জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করতো। তারা দলবদ্ধভাবে এইসব দেশে গিয়ে বসবাস করতো। তাদের এই বসতিগুলোকে উপনিবেশ বলা হয়। যেখানে তারা বসতি স্থাপন করতো সেখানকার লোকের সাথে তারা মিশে যেতো না। বিদেশে এসেও তারা গ্রীক ভাষাতেই কথা বলতো। দূর দেশে এসেও তারা মাতৃভূমির আচার-ব্যবহার, নিয়মকানুন সব মেনে চলতো। তারা পুরাতন মাতৃভূমির অধীন ছিল না। উপনিবেশে তারা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতো। কিন্তু মাতৃভূমির সাথে তাদের সম্পর্ক ভালই থাকতো। তারা গ্রীসের ধর্মীয় সভাসমিতি ও খেলাধূলা প্রভৃতি

আমোদপ্রমোদে অংশ নিত। গ্রীক জাতি ছাড়া অন্য কারও এই সব সভাসমিতি বা আমোদপ্রমোদে অংশ নেবার অধিকার ছিল না।

নানা কারণে গ্রীকরা দূর দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করতো। গ্রীসের ভূমি ছিল অনুর্বর। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তা ছাড়া এই সময়ে জমিদারদের হাতে ছিল অধিকাংশ জমি। সাধারণ লোকদের হাতে বেশী জমি থাকতো না। ফলে, সাধারণ লোকের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। নতুন দেশে গিয়ে বেশী জমির মালিক হওয়া সম্ভব। সুতরাং তারা উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী হয়।

গ্রীসের সব জায়গা থেকেই সমুদ্র খুব কাছে। সমুদ্রের কাছে থাকার ফলে তারা সমুদ্রকে ভয় করতো না। ফলে, সমুদ্রপারে নতুন দেশকে জানবার ও সেখানে বসতি স্থাপন করার আগ্রহ দেখা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ও অজানাকে জানার আগ্রহও উপনিবেশ স্থাপনের কারণ।

গ্রীসের পূর্বে ঈজিয়ান সাগর। এই ঈজিয়ান সাগরে অনেক দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলোতে গ্রীকরা অনেক উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশগুলোর মধ্যে লেসবস্, স্তামস্, রোডস্ প্রভৃতি প্রধান। কৃষ্ণসাগরের উপকূলেও তারা উপনিবেশ স্থাপন করে। এ ছাড়া তারা সুদূর ইটালী, সিসিলি, স্পেন, ফ্রান্স ও আফ্রিকাতেও বসতি স্থাপন করে।

উপনিবেশ স্থাপনের ফলে গ্রীকদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হয়। বিদেশে এসে তারা বুঝতে পারে যে, বিদেশীদের সাথে তাদের আচার-ব্যবহারের কোন মিল নেই। এর ফলে সমস্ত গ্রীকরা যে একজাতি, সেকথা তারা উপলব্ধি করে। আবার কখনো দু'তিনটি রাষ্ট্রের লোক মিলে উপনিবেশ স্থাপন করতো। দেশে তারা পরস্পরের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেতো না। কিন্তু উপনিবেশে এক সাথে বাস করার ফলে তারা পরস্পরকে চেনার সুযোগ পেলো। উপনিবেশ স্থাপনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। সমুদ্রপথে

দূর দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে গ্রীকদের নৌশক্তিও বৃদ্ধি পায়।

অ্যাথেন্স ও স্পার্টা—
তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন

স্পার্টা: গ্রীসের দক্ষিণ অংশের নাম পেলোপনেসাস্। এই পেলোপনেসাসের দক্ষিণ অংশে ছিল স্পার্টা রাজ্য। গ্রীক জাতির ডোরিয়ান শাখার লোকেরা এই রাজ্য গড়ে তোলে। প্রাচীন কালে স্পার্টা গ্রীসের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য বলে পরিচিত হয়। স্পার্টার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন ছিল এক বিশেষ ধরনের। এই বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতিই তাকে গ্রীসের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করে।

স্পার্টায় দু'জন রাজা থাকতেন। কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠানে তাঁরা পুরোহিতের কাজ করতেন। যুদ্ধের সময়ে একজন রাজা সেনাপতির কাজ করতেন। কয়েক রকমের ফৌজদারী মকদ্দমার বিচারও তাঁরা করতেন। দু'জন রাজা ও অভিজাতদের আটাশজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি সমিতি ছিল। এই সমিতির নাম জেরুজিয়া। ষাট বছরের কম বয়সের লোক এই সভায় স্থান পেতো না। অভিজাতদের এই প্রতিনিধিরা সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হ'তো। এই সমিতি রাজাকে পরামর্শ দিতো ও ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার করতো।

সমস্ত স্বাধীন লোক নিয়ে গঠিত হ'তো সাধারণের সভা। এই সভার সকলের বয়স ছিল ত্রিশ বছর বা তার চেয়ে বেশী। এই সভা কিছু আলোচনা করতে পারতো না। এরা রাজার প্রস্তাবে সম্মতি বা অসম্মতি জানাতো মাত্র। এই সভাকে বলা হ'তো অ্যাপেলা।

এ ছাড়া পাঁচজন গণপ্রতিনিধি এক বছরের জন্য নির্বাচিত হ'তো। এদের বলা হ'তো 'ইফর'। এরা ছিল সর্বোচ্চ দেওয়ানী বিচারক। রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল এদের উপর।

স্পার্টার শাসনব্যবস্থায় অভিজাতদের বা প্রধানদের ক্ষমতাই ছিল বেশী।

স্পার্টার অধিবাসীরা ছিল তিন ভাগে বিভক্ত। আগেই বলা হয়েছে, গ্রীক জাতির ডোরিয়ান শাখা স্পার্টায় আধিপত্য স্থাপন করে। এদের বলা হ'তো স্পার্টান। এদের মধ্যে প্রধানরা ছিল বড় বড় জমিদারির মালিক। সাধারণ স্পার্টানরাও ছিল ছোট ছোট জমির মালিক। এই জমি চাষ করতো ভূমিদাসরা। যাদের পরাজিত করে স্পার্টানরা ঐ অঞ্চল জয় করে, তাদের ভূমিদাস বা হেলটে পরিণত করা হয়। এদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করা হ'তো। এ ছাড়া আরও কিছু অধিকারহীন স্বাধীন লোক ছিল। এদের বলা হ'তো পেরিওকি।

ভূমিদাস বা হেলটরা প্রায়ই বিদ্রোহ করতো। আশেপাশের রাজ্যগুলিও স্পার্টার শত্রু ছিল। এই সমস্ত বিপদ হতে রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত স্পার্টানরাই যুদ্ধ করতে শিখতো ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতো। স্পার্টানদের জীবিকার জন্য কোন কাজ করতে হ'তো না। তাদের কাজ ছিল যুদ্ধ করতে শেখা এবং সব সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা।

স্পার্টানদের জীবন জন্ম থেকেই এক বাঁধাধরা নিয়মে চলতো। জন্মের পরই শিশুকে পরীক্ষা করা হ'তো। যদি শিশু দুর্বল বা রুগ্ন হ'তো তবে তাকে ট্যাগেটাস পর্বতে ফেলে রাখা হ'তো; তাকে বাঁচিয়ে রাখার কোন দরকার ছিল না। সাত বৎসর বয়সে প্রত্যেক বালককে সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হ'তো। বাড়ি থেকে দূরে সামরিক বিদ্যালয়ে কঠোর শাসনের মধ্যে তাকে সামরিক শিক্ষা পেতে হ'তো। ত্রিশ বছর বয়সে স্পার্টানরা বিয়ে করতে পারতো। কিন্তু ষাট বছর পর্যন্ত তাদের পরিবারের বাইরে সামরিক শিবিরে বাস করতে হ'তো।

এইসব নিয়মকানুনের উদ্দেশ্যই ছিল সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা। সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি স্পার্টায় উৎসাহ পেতো না। স্পার্টানরা পেতো প্রাথমিক শিক্ষা। ব্যবসা করা, টাকা-পয়সা

জমানো বা বিলাসিতা নিষিদ্ধ ছিল। এই সব নিয়মকানুনের ফলে স্পার্টা গ্রীসের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্পার্টানরা বিশ্বাস করতো লাইকারগাস নামে এক ব্যক্তি এই সমস্ত নিয়মকানুন রচনা করেন।

অ্যাথেন্স : মধ্য গ্রীসের এটিকা প্রদেশে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এইগুলির মধ্যে একটির নাম ছিল অ্যাথেন্স। অতি প্রাচীন কালে অ্যাথেন্স এই রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এক কথায়, অ্যাথেন্সের সাথে ঐ রাজ্যগুলি মিশে যায়। এটিকার সব স্বাধীন লোকই ছিল অ্যাথেন্সের নাগরিক। প্রাচীন কালে অ্যাথেন্সে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু বড় বড় জমিদার বা প্রধানরা রাজার ক্ষমতা কমাতে আরম্ভ করে। রাজার পরিবর্তে প্রধানদের ন'জন প্রতিনিধি রাজ্য শাসন করতে থাকে। এদের বলা হ'তো আর্কন। কিন্তু এদের মধ্যে একজনের উপাধি ছিল রাজা।

এই যুগে অ্যাথেন্সের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো, তারা ক্রমে ধনী হয়ে ওঠে। এত দিন প্রধানরা দেশ শাসন করতো। এখন এরাও দেশ শাসনের অধিকার দাবি করে। এত দিন অ্যাথেন্সে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো বিনিময়-প্রথায়। এই সময়ে মুদ্রার প্রচলন হয়। ফলে, সাধারণের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে ঋণ-সংক্রান্ত আইন খুব কঠোর ছিল। দরিদ্র কৃষকরা জমি বন্ধক দিয়ে উচ্চ সুদে টাকা ধার করতো। ধার শোধ করতে না পারলে তারা জমি হারাতো এবং কখনও কখনও ক্রীতদাসে পরিণত হ'তো

এই অবস্থার কিছুটা প্রতিকার করেন সোলন। আর্কনের পদ লাভ করে তিনি ঋণ-সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন করেন। ঋণের জন্য যারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। স্থির হয়, ধার শোধ করতে না পারলে আর কোন লোককে ক্রীতদাসে পরিণত করা যাবে না। সোলন শাসন-ব্যবস্থারও সংস্কার করেন। যাদের সম্পত্তি ছিল, একমাত্র তারাই এই সময়ে দেশ-শাসনে অংশ নিতে পারতো। যাদের সম্পত্তি ছিল না, তাদের কোন অধিকারও ছিল না। সোলন এই সম্পত্তিহীন

স্বাধীন লোকদের সাধারণের সভায় প্রবেশের অধিকার দান করেন।

সোলন সাধারণের বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সম্পত্তির মালিক বা সম্পত্তিহীন সমস্ত শ্রেণীর লোকই বিচারক হতে পারতো। সুতরাং সোলনের সংস্কারে সমস্ত শ্রেণীর লোকই দেশ শাসনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু শাসন-ব্যাপারে ধনীদেরই সুযোগ বেশী থাকে। সোলন ৪০০ জন সদস্য নিয়ে এক প্রতিনিধি সভা গঠন করেন। এই সভায় সম্পত্তিহীন স্বাধীন লোকের কোন স্থান ছিল না।

সোলনের শাসন-সংস্কারের পর পিসিষ্ট্রাটাস্ নামে এক ব্যক্তি অ্যাথেন্সের শাসনক্ষমতা দখল করেন। তাঁর পুত্র হিপিয়াসকে বিতাড়িত করে আবার পুরানো শাসন-ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থার দোষত্রুটিগুলি সংশোধন করেন ক্লাইস্থিনিস্। তিনি সোলনের প্রতিনিধি সভার পরিবর্তন করেন। ৪০০ জনের পরিবর্তে ৫০০ জন প্রতিনিধি নিয়ে এই নতুন প্রতিনিধি সভা গঠিত হয়। এই সভার হাতে দেশ-শাসনের অধিকাংশ ক্ষমতাই দেওয়া হয়। সোলন ও ক্লাইস্থিনিসের সংস্কারের ফলে অ্যাথেন্স গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

স্পার্টা ও অ্যাথেন্সের বিরোধ: "খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষভাগে স্পার্টা ও অ্যাথেন্সের মধ্যে বিরোধ বাধে।"

অ্যাথেন্সের শক্তিবৃদ্ধিতে স্পার্টা, কোরিন্থ প্রভৃতি রাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হয়। এর ফলে স্পার্টার নেতৃত্বে গ্রীসের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সাথে অ্যাথেন্সের দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ পেলোপনেসাসের যুদ্ধ বলে পরিচিত। এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় ৪৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং শেষ হয় ৪০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই সাতাশ বছরের যুদ্ধে অ্যাথেন্সের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। পেলোপনেসাসের যুদ্ধে স্পার্টা জয়লাভ করলেও অল্পদিনের মধ্যে তারও পতন ঘটে।

অ্যাথেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব—সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম: পারস্যের পরাজয়ের পর অ্যাথেন্স এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তার ব্যবসা-

বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ফলে, অ্যাথেন্স গ্রীসের মধ্যে সব চেয়ে ধনী ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই সময়ে প্রায় ত্রিশ বছর অ্যাথেন্সের শাসন পরিচালনা করেন পেরিক্লিস্। তাঁর শাসনে অ্যাথেন্সে সাহিত্য ও শিল্পের অসাধারণ উন্নতি ঘটে। পেরিক্লিস্ সাহিত্য ও শিল্পের সমর্থক ছিলেন।

গ্রীক সাহিত্যের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ নাটক। এই নাটকের সব চেয়ে বেশী উন্নতি হয় অ্যাথেন্সে। **এসকাইলাস্** এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তিনি সত্তরখানা নাটক রচনা করেন। তাঁর দু'খানি বিখ্যাত নাটক 'প্রমিথিউস্ বাউণ্ড' ও 'ওরেষ্টিয়া'।

নাটকের আরও উন্নতি করেন **সোফোক্লিস্**। সোফোক্লিস্ ছিলেন পেরিক্লিসের বন্ধু। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'ওয়েদিপাস'। সোফোক্লিস চিত্রিত দৃশ্যপট দিয়ে অভিনয়কে সুন্দর করেন। সোফোক্লিসের নাটকের চরিত্রগুলি ছিল আদর্শ মানুষ। সাধারণ মানুষের কথা নিয়ে নাটক রচনা করেন **ইউরিপিডিস্**।


হেরোডোটাস্

পেরিক্লিসের সময় গদ্য সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। গদ্য লেখকদের মধ্যে **হেরোডোটাসের** নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পারস্যের সাথে গ্রীসের যুদ্ধ পর্যন্ত মিশর, পশ্চিম এশিয়া ও গ্রীসের ইতিহাস তিনি রচনা করেন। তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তাঁর ভাষা ছিল সুন্দর ও সরল।

সাহিত্যের মত এই যুগে অ্যাথেন্সে শিল্পকলারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। পারস্যের আক্রমণে যে সমস্ত মন্দির ধ্বংস হয়েছিল, পেরিক্লিস সেগুলো আবার নতুন করে তৈরি করার ব্যবস্থা করেন।

অ্যাথেন্সের নগর-দুর্গ বা অ্যাক্রোপলিসকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়। এই যুগে তৈরি মন্দিরগুলির মধ্যে পার্থেনন সব চেয়ে বিখ্যাত। পেরিক্লিস এই মন্দির নির্মাণের ভার দেন বিখ্যাত শিল্পী ইক্‌টিনাসের ওপর। পেরিক্লিসের বন্ধু ফিডিয়াস্ এই সময়ে অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্তি তৈরি করেন। এর মধ্যে অ্যাথেনার মূর্তি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া মন্দিরের গায়ে অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্তি খোদাই করা হয়। মন্দিরের গায়ে অনেক ছবিও আঁকা হয়। এই সব মূর্তি ও ছবিগুলো এতো সুন্দর যে, এদের তুলনা হয় না।



অ্যাথেনার মূর্তি

এই যুগে অ্যাথেন্সে সাহিত্য ও শিল্পের মত দর্শনেরও উন্নতি হয়। এই যুগের দার্শনিকদের মধ্যে **সক্রেটিসের** নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। সক্রেটিস্ সুশ্রী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন বলবান ও কষ্টসহিষ্ণু। তিনি ছিলেন চিন্তাশীল দার্শনিক। তিনি বাজার প্রভৃতি জনপূর্ণ স্থানে যুবকদের নানারকম প্রশ্ন করতেন। এই সব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতেন, সাধারণ লোকের জ্ঞান কত কম। যুক্তি ছাড়া কোন জিনিসই তিনি মেনে নিতেন না। সামাজিক রীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম প্রভৃতি সব কিছুরই তিনি সমালোচনা করতেন। যাঁরা দেশ শাসন করতেন, তাঁরা এই সমালোচনায় ভয় পেলেন। সক্রেটিস্ যুবকদের বিপথে চালাচ্ছেন এই অভিযোগে শাসকরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সক্রেটিস্ হাসিমুখে এই দণ্ড গ্রহণ করেন।



সক্রেটিস্

অ্যাথেন্সে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতির যে অসাধারণ উন্নতি ঘটে, তার মূলে ছিলেন **পেরিক্লিস**। পেরিক্লিস্ ছিলেন এ যুগের অ্যাথেন্সের শ্রেষ্ঠ নেতা। তিনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুন্দর, সুশিক্ষিত ও ভাল বক্তা ছিলেন। তিনি দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। প্রায় তিরিশ বছর জনসাধারণ তাঁকে বার বার প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই সময়ে তিনি জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা অনেক বাড়িয়ে দেন। সমস্ত স্বাধীন লোকই সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে। এক কথায়, অ্যাথেন্সে তিনি গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। তাঁর সময়ে অ্যাথেন্সের সাম্রাজ্যও বৃদ্ধি পায়।



পেরিক্লিস্

পেরিক্লিস্ অ্যাথেন্সের শিল্প ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। অ্যাথেন্সের মন্দিরগুলো নতুন করে তৈরি করার পরিকল্পনা তিনিই করেন। শিল্পী, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাঁর বন্ধু। তাঁর উৎসাহেই অ্যাথেন্সে শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের অসাধারণ উন্নতি ঘটে।

ম্যাসিডন ঃ অ্যাথেন্স ও স্পার্টার পতনের পর ম্যাসিডন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উত্তর গ্রীসের এই রাষ্ট্র এতদিন ছিল খুব দুর্বল। এই রাজ্যের রাজা ফিলিপ ম্যাসিডনকে গ্রীসের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন এবং প্রায় সমস্ত গ্রীস জয় করেন। তিনি পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্যও প্রস্তুত হন। কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রার আগেই তিনি এক ঘাতকের হাতে নিহত হন।

আলেকজাণ্ডার ঃ ফিলিপের মৃত্যুর পর ৩৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের রাজা হন। তিনি

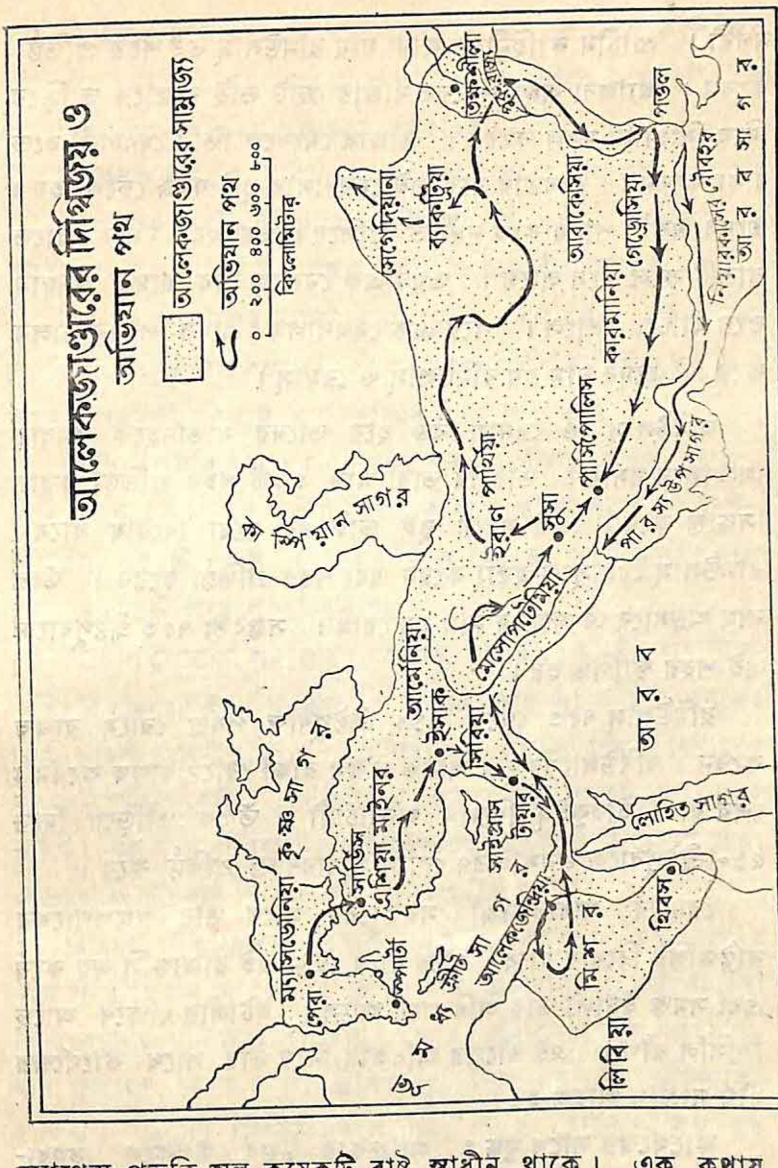
সমস্ত গ্রীসের উপর নিজের অধিকার স্থাপন করে, পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি গগামেলার যুদ্ধে পারস্য-সম্রাট দরায়ুসকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। তারপর তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন এবং ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন।



আলেকজাণ্ডার

এই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে কোন মিল ছিল না। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের পক্ষে এগুলো জয় করা সহজ হয়। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু ঝিলাম নদীর তীরে তাঁকে বাধা দিলেন পুরু। যুদ্ধে পুরু পরাজিত ও বন্দী হন। এর পর আলেকজাণ্ডার প্রায় সমস্ত পাঞ্জাব জয় করেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা আর অগ্রসর হতে না চাওয়ায় আলেকজাণ্ডারকে ফিরে যেতে হয়। ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ৩২ বছর বয়সে ব্যাবিলনে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের পতন—রোম কর্তৃক গ্রাস জয়: আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। গ্রীকদের মধ্যে এই সময়ে কোন ঐক্য ছিল না। ম্যাসিডনও দুর্বল হয়ে পড়ে। ম্যাসিডনের সাথে এই সময়ে ইটালীর শক্তিশালী রাষ্ট্র রোমের যুদ্ধ বাধে। ম্যাসিডনের সাথে রোমের পর পর তিনটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অন্যান্য গ্রীক রাষ্ট্রও জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রোম জয়লাভ করে। ম্যাসিডন ও উত্তর গ্রীস রোমের অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়। অধিকাংশ গ্রীক রাষ্ট্রই রোমকে কর দান করতে বাধ্য হয়।



অ্যাথেন্স প্রভৃতি অল্প কয়েকটি রাষ্ট্র স্বাধীন থাকে। এক কথায়, গ্রীসের রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা হারিয়ে রোমের অধীনে আসে।

রোম

রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা : ইউরোপের দক্ষিণে আছে তিনটি উপদ্বীপ—পশ্চিমে স্পেন-পোর্তুগাল, পূর্বে গ্রীস আর মাঝখানে ইটালী। এই ইটালীর মাঝামাঝি জায়গায় গড়ে উঠেছে রোম

নগরী। প্রাচীন কাহিনীতে জানা যায় রমিউলাস্ এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যালবা লঙ্গা 'শহরের রাজার ছোট ভাই রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করেন। রাজার মেয়েকে তিনি দেবদাসী হতে বাধ্য করেন। দেবতার বরে এই দেবদাসীর ছুটি যমজ ছেলে হয়। এদের একটা পাত্রে করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। নদীর স্রোতে পাত্রটি কূলে এসে লাগে। তখন এক নেকড়ে বাঘ এদের স্তনদান করে বাঁচিয়ে তোলে। পরে এক মেষপালক এদের লালন-পালন করে। এদের নাম হয় রমিউলাস্ ও রেমাস্।

রমিউলাস্ ও রেমাস্ বড় হয়ে তাদের মাতামহকে আবার সিংহাসনে বসায়। তারপর তারা আর একটি শহর প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত করে। এই সময়ে ছুই ভাই-এর মধ্যে বিরোধ বাধে। রমিউলাস্ রেমাস্‌কে হত্যা করেন এবং শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম অনুসারে ঐ শহরের নাম হয় রোম। সম্ভবতঃ ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই শহর স্থাপিত হয়।

রমিউলাস্ ৭৫৩ থেকে ৭১৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রোমে রাজত্ব করেন। রমিউলাসের পর আরও ছ'জন রাজা রোমে রাজত্ব করেন। শেষ রাজা টারকুইন্ ছিলেন অত্যাচারী। তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে ৫১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জনসাধারণ রোমে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

রোমের সাধারণতন্ত্রী সরকারের সাথে তার আশেপাশের রাষ্ট্রগুলির বিরোধ বাধে। ধীরে ধীরে রোম এই রাজ্যগুলি জয় করে এবং সমস্ত ইটালী তার অধিকারে আসে। ইটালীর দক্ষিণে আছে সিসিলি দ্বীপ। এই দ্বীপের অধিকার নিয়ে তার সাথে কার্থেজের দীর্ঘ সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

কার্থেজের সাথে যুদ্ধ ঃ আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ভূমধ্য-সাগরের তীরে ছিল কার্থেজ। ফিনিশীয়রা ছিল কার্থেজের প্রতিষ্ঠাতা। কার্থেজ ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় হয়ে ওঠে। জলযুদ্ধেও এই অঞ্চলে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না।

কার্থেজ কর্সিকা, সার্ডিনিয়া ও সিসিলির এক অংশ জয় করে। স্পেনের দক্ষিণাংশে ও আফ্রিকার উপকূলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল তার অধীনে ছিল। এই কার্থেজের সাথে রোমের তিনবার যুদ্ধ হয়। এই

যুদ্ধ তিনটিকে পিউনিক যুদ্ধ বলা হয়। রোমের লোকেরা কার্থেজের ফিনিশীয় অধিবাসীদের 'পয়েনী' বলতো। এর থেকেই ফিনিশীয়দের সাথে এই যুদ্ধ পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত।

পিউনিক যুদ্ধ : সিসিলিতে কার প্রাধান্য স্থাপিত হবে, রোমের না কার্থেজের—এই নিয়ে ২৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রথম পিউনিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে কার্থেজ পরাজিত হয়ে সন্ধি করে।

এর পর কার্থেজের সাথে রোমের আবার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধকে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধেও কার্থেজ পরাজিত হয় এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে রোমের সাথে সন্ধি করে।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের ৫০ বছর পর কার্থেজের সাথে রোমের আবার যুদ্ধ হয়। এই তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের পতন ঘটে। কার্থেজ শহরটি ধ্বংস করা হয়। কার্থেজের অধীনস্থ দেশগুলি রোমের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

প্রাচীন রোমের সমাজ : রোমের সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলে ছিল পরিবার। মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, আজ্ঞাবহ (ক্লায়েন্ট) ও ক্রীতদাসদের নিয়ে গঠিত হ'তো পরিবার। পরিবারের প্রধানই ছিল পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির কর্তা। পরিবারের প্রত্যেকের উপরই ছিল তার কর্তৃত্ব। এই যুগে পরিবারের কর্ত্রীকেও যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হ'তো। কতকগুলি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠিত হ'তো।

রোমের অধিবাসীরা ছিল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম প্যাট্রিশিয়ান আর অপর শ্রেণীর নাম প্লেবিয়ান। প্যাট্রিশিয়ানরা ছিল রোমের অভিজাত সম্প্রদায়। আর প্লেবিয়ানরা ছিল অধিকার-হীন সাধারণ লোক। প্যাট্রিশিয়ানরা ছিল বড় বড় জমিদারির মালিক। দেশের শাসনক্ষমতাও ছিল তাদের হাতে। বড় বড় রাজপদগুলি ছিল প্যাট্রিশিয়ানদের হাতে। আইনের ব্যাখ্যা করতো পুরোহিতরা। প্যাট্রিশিয়ান ছাড়া আর কেউ পুরোহিত হ'তে পারতো না।

প্লেবিয়ানদের বিশেষ কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। তারা কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হ'তে পারতো না। প্যাট্রিশিয়ানদের সাথে প্লেবিয়ানদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সরকারী জমি কৌশলে

প্যাট্রিশিয়ানরাই ভোগ করতো। ঋণ-সংক্রান্ত আইন ছিল কঠোর। দেনার দায়ে অনেককেই ক্রীতদাসে পরিণত হতে হ'তো। প্লেবিয়ানরা ছিল ছোট ছোট জমির মালিক। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তাদের প্রায়ই যুদ্ধে যেতে হ'তো। এই সময়ে তারা জমি চাষ করতে পারতো না। ফলে, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তাদের ধার করতে হ'তো। আর ধার শোধ দিতে না পেরে তারা ক্রীতদাসে পরিণত হ'তো।

প্রায় ছু'শো বছর ধরে প্লেবিয়ানরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এই সময়ে রোমকে প্রায়ই পাশের রাজ্যগুলির সাথে যুদ্ধ করতে হ'তো। প্লেবিয়ানদের সাহায্য ছাড়া প্যাট্রিশিয়ানদের পক্ষে এই যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না।

৪৯৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই রকম এক যুদ্ধের পর প্লেবিয়ানরা দেখলো যে, তাদের অনেকেই দেনার দায়ে ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছে। তখন তারা রোম ত্যাগ করে যাবার সঙ্কল্প করে। তারা পৃথক নগর স্থাপনের কথা ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় প্যাট্রিশিয়ানরা ভয় পায় এবং প্লেবিয়ানদের কিছু কিছু দাবি মেনে নেয়। দেনার দায়ে যারা দাসে পরিণত হয়েছিল, তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। প্লেবিয়ানদের স্বার্থরক্ষার জন্য ছু'জন প্লেবিয়ান নির্বাচিত হ'তো। এদের বলা হ'তো ট্রিবিউন। এদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতার বলে তারা যে-কোন রাজকর্মচারীর আদেশ নাকচ করে দিতে পারতো।

এর পর প্লেবিয়ানরা অন্যান্য অভিযোগেরও প্রতিকার দাবি করে। রোমে কোন লিখিত আইন ছিল না। প্যাট্রিশিয়ানরা খুশিমতো আইনের ব্যাখ্যা করতো। প্লেবিয়ানরা আন্দোলন করে লিখিত আইনের প্রবর্তন করে। ক্রমে প্লেবিয়ানরা কন্সাল প্রভৃতি সমস্ত উচ্চ রাজপদ লাভের অধিকার পায়। ধর্ম সম্বন্ধেও তারা সমান অধিকার লাভ করে। দীর্ঘ ছু'শো বছর সংগ্রামের পর প্যাট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ানদের বিভেদ দূর হয়।

রোমান নাগরিক অধিকার ঃ রোম আগেই সমস্ত ইটালী জয় করেছিল। তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের পর কার্থেজের বিশাল সাম্রাজ্য

তার দখলে আসে। এর পর রোম গ্রীস জয় করে। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিও তার অধীনে আসে। বিজয়ী রোমানরা বিদেশ থেকে প্রচুর ধনরত্ন দেশে নিয়ে আসে। রোমের এই ধন-বৃদ্ধির ফলে সাধারণ লোকও কিছু কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকে। এই সুযোগ-সুবিধা যাতে সমস্ত ইটালীর লোকে না পায়, সেদিকে রোমের অধিবাসীদের নজর ছিল।

রোমের নাগরিকরাই কেবল উচ্চ রাজপদে নির্বাচিত হতে পারতো। পরবর্তী কালে অল্প মূল্যে শস্য কেনা, বিনা ব্যয়ে আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতিতে অংশ নেওয়া প্রভৃতি সুযোগও তারা লাভ করে।



অ্যাম্পি থিয়েটার

রোমের নাগরিকরা যে সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করতো, তাকেই রোমান নাগরিক অধিকার বলে। এই অধিকার যাতে সমস্ত ইটালীর লোকে না পায়—অর্থাৎ বেশী লোকের মধ্যে ভাগ না হয়ে যায়, সেদিকে রোমানদের দৃষ্টি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইটালীর অধিকাংশ অধিবাসীই এই অধিকার লাভ করে।

দাসত্ব : পিউনিক যুদ্ধের সময় থেকে রোমকে দীর্ঘ দিন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়। রোমের প্রত্যেক নাগরিককেই প্রয়োজনের সময়ে যুদ্ধে যেতে হ'তো। এদের অধিকাংশই ছিল ছোট ছোট জমির মালিক। যুদ্ধে যাওয়ার ফলে তারা চাষবাস করতে পারতো

না। যুদ্ধের সময়ে তারা বিদেশে নানারকম বিলাসিতা করার সুযোগ পেতো। দীর্ঘ দিন আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার পর তারা আর গ্রামে এসে চাষবাস করতে চাইতো না। তারা তাদের জমি বিক্রি করে শহরে এসে ভিড় করতো। বড় বড় জমিদাররা এইসব জমি কিনে বড় বড় জমিদারি সৃষ্টি করতো। এই জমিদারি-গুলিকে বলা হ'তো ল্যাটিফাণ্ডিয়া।

এই জমিদারিগুলিতে কাজ করার জন্য শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। জমিদারদের কাজ করার জন্য এই সময়ে দাস-শ্রমিক নিয়োগ করা আরম্ভ হয়। প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধ-বন্দীদের দাসে পরিণত করা হ'তো। সাধারণতঃ এদের বাড়ির কাজে লাগানো হ'তো। এদের কোন আইনসঙ্গত অধিকার না থাকলেও ধনীর গৃহে এদের অবস্থা অসহ্য ছিল না। কিন্তু এই সময় থেকে চাষবাস, পশুপালন প্রভৃতিতে এদের নিয়োগ আরম্ভ হয়। ফলে, ক্রীতদাসের ব্যবসা লাভজনক হয়ে ওঠে।

বিশাল জমিদারিগুলির কাজে ক্রীতদাসদের লাগানো হ'তো। এদের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হ'তো। জমিদারিগুলিতে শিকলে বেঁধে এদের কাজ করানো হ'তো। এই অসহ্য অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রীতদাসরা বার বার বিদ্রোহ করতো। বার বার দাস-বিদ্রোহে রোমের সাম্রাজ্যের বিপদ দেখা দেয়।



রোমের ক্রীতদাস

দাস-বিদ্রোহ : সিসিলিতেই প্রথম দাস-বিদ্রোহ ঘটে। ইউনুস্, স্যালভিয়াস্ ও অ্যাথেনিওর নেতৃত্বে ক্রীতদাসগণ বার বার বিদ্রোহ করে। রোম এই সব বিদ্রোহ চরম নিষ্ঠুরতার সাথে দমন করে।

কিন্তু স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে যে দাস-বিদ্রোহ হয় তা দমন করতে রোমকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। স্পার্টাকাস ছিলেন উঁচুদরের সংগঠক

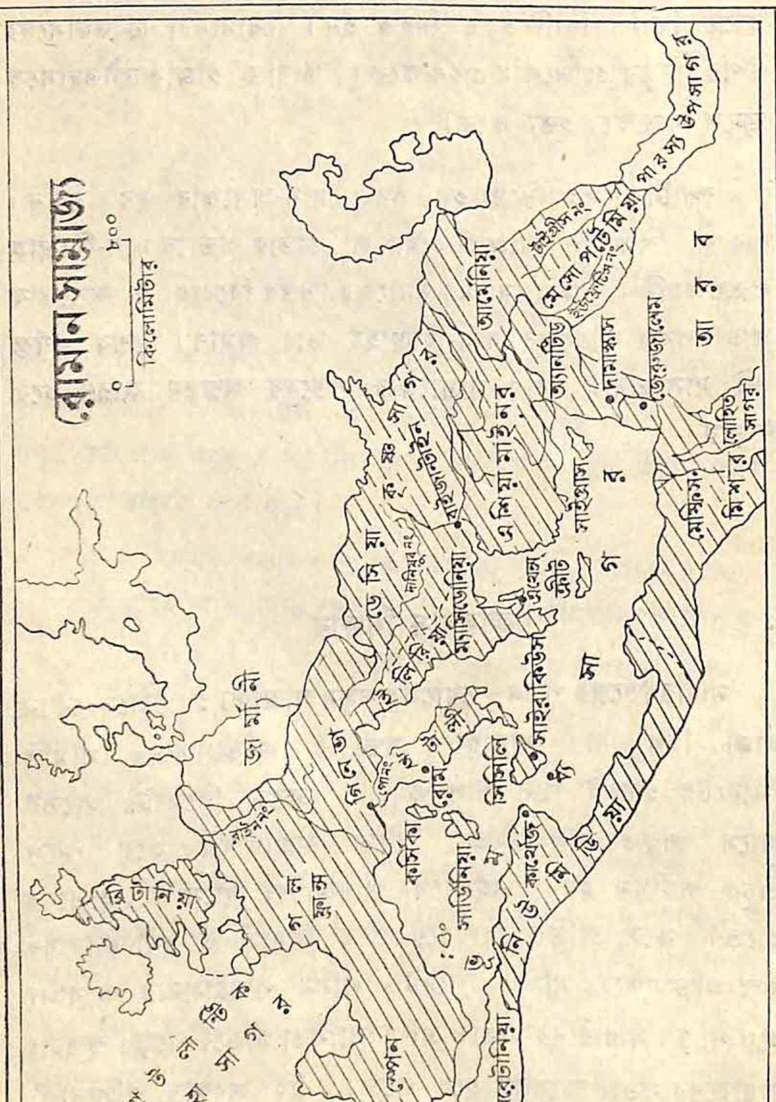
ও সেনাপতি। তিনি রোমের বাহিনীকে পরাজিত করেন। প্রায় সমস্ত দক্ষিণ ইটালী তাঁর পদানত হয়। মুটিনার যুদ্ধে তিনি আবার রোমানদের পরাজিত করেন। কিন্তু রোমান সেনাপতি ক্র্যাসাসের হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। রোমানরা ক্রীতদাসদের উপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তারা ছ' হাজার ক্রীতদাসকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করে।

স্পার্টাকাসের বিদ্রোহের পরও দাস-অসন্তোষ দূর হয়নি। একতা, শিক্ষা ও সমাজ-জীবনের অভিজ্ঞতার অভাবে দাস-বিদ্রোহ সফল হয়নি। কিন্তু রোমের সমাজের ভিতর বিরোধ ও অসন্তোষ কত প্রবল বারংবার দাস-বিদ্রোহই তার প্রমাণ। শেষ পর্যন্ত এই দাস-প্রথাই রোম সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জুলিয়াস সিজার

সাধারণতন্ত্রের পতন—রোমের নতুন সাম্রাজ্য : রোমে কোন রাজা ছিল না। সাধারণের সভা ও অভিজাতদের সমিতি সিনেটের হাতেই ছিল শাসনক্ষমতা। ক্রমে সিনেটের হাতেই আসে প্রকৃত শাসনক্ষমতা। কিন্তু রাজ্যজয়ের ফলে দেশে প্রচুর অর্থাগম হয়। এই অর্থের অধিকাংশই আসে অভিজাতদের হাতে। ফলে, অভিজাতরা হয়ে পড়ে বিলাসী ও দুর্নীতিপরায়ণ এবং অভিজাতদের সমিতি সিনেটও শাসন পরিচালনার অযোগ্য হয়ে পড়ে। সাধারণের মধ্যেও এই বিলাসিতা ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং সাধারণের সভাও অযোগ্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় শক্তিশালী লোকেরা শাসনক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টা করে। পম্পে, ক্র্যাসাস্ ও জুলিয়াস সিজার চুক্তি করে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। কিন্তু শীঘ্রই এঁদের মধ্যে বিরোধ বাধে। এক যুদ্ধে ক্র্যাসাসের মৃত্যুর পর পম্পে ও সিজারের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সিজারের জয় হয়। সিজারই হয়ে দাঁড়ান রোমান সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা।



সিজার সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু তিনি আগেকার শাসনব্যবস্থা বাহ্যতঃ বজায় রাখেন। আগের মতই সাধারণ সভা ও

সিনেটের অধিবেশন বসতো এবং রাজকর্মচারীরা নির্বাচিত হ'তো। কিন্তু সমস্তই হ'তো সিজারের ইচ্ছামত। বাহ্যতঃ সিজারের শাসন ছিল সাধারণতন্ত্র কিন্তু কার্যতঃ সিজার ছিলেন একনায়ক। তাঁর ইচ্ছাতেই শাসন পরিচালিত হ'তো। সিজার সুশাসক ছিলেন। তিনি ঋণসংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন করে ঋণগ্রস্তদের কিছু সুবিধা দান করেন। ভূমিহীন কৃষকদের জন্য কার্থেজ ও কোরিন্থে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং জলাভূমিগুলির জলনিকাশের ব্যবস্থা করে চাষবাসের উন্নতি করেন।


জুলিয়াস সিজার

সিজার সিনেটের ক্ষমতা কমিয়ে দেন। জনসাধারণের মধ্যেও ধারণা জন্মে যে, সিজার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। সিনেটের ষাটজন সদস্য সিজারকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সিনেটের অধিবেশনের সময়ে ৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিজারকে হত্যা করা হয়। কিন্তু সিজারকে হত্যা করেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা রোধ করা গেল না। আর একবার গৃহযুদ্ধের পর সিজারের পোষ্যপুত্র অক্টেভিয়াস রোমে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনিও রোমে বাহ্যতঃ সাধারণতন্ত্র বজায় রেখে সমস্ত ক্ষমতা নিজেই হাতে নেন। তিনি কখনই নিজেকে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করেননি। সিনেটকে তিনি সম্মান দেখাতেন। সিনেট তাঁকে অগষ্টাস্ উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে সিনেটই তাঁর হাতে নানা ক্ষমতা তুলে দেয়। কিন্তু অগষ্টাসের মৃত্যুর পর রোম প্রকাশ্যেই রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। রোমের শাসকদের উপাধি হয় সম্রাট।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন: খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। উত্তরাধিকারের কোন নিয়ম না থাকায় সম্রাটের মৃত্যুর পর প্রায়ই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হ'তো। সম্রাটরা অনেকেই ছিলেন অত্যাচারী। এই সময়ে রোমের সমাজও দুর্বল

হয়ে পড়ে। বড় বড় জমিদারিতে বেশী সংখ্যক দাস-শ্রমিক নিয়োগ করা হ'তো। ফলে, দেশে স্বাধীন কৃষক সম্প্রদায় ধ্বংস হয়। বেকার, ভবঘুরে লোকেরা শহরে ভিড় করে। এই সব লোকের দ্বারা সাম্রাজ্য রক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এই সময়ে বার বার বর্বর জাতিদের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। ভিসিগথ, ভ্যাণ্ডাল, হূণ প্রভৃতি বর্বর জাতিরা বার বার রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। রোমান সম্রাটরা বর্বর জাতিগুলির মধ্য থেকে ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ করতে আরম্ভ করে। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ওডোভেকারের নেতৃত্বে জার্মান ভাড়াটে সৈন্যরা রোমের শেষ সম্রাট রমিউলাস্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করে। এইভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব ঃ অগষ্টাসের সময়ে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার হয়। ন্যাজারেথের যীশুখ্রীষ্ট এই ধর্ম প্রচার করেন। যীশু তাঁর অনুগতদের কাছে ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র ও মানবজাতির পরিত্রাতা। তারা তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করতো। কিন্তু ইহুদী পুরোহিতরা তাঁকে ভাল চক্ষে দেখতো না। তারা রোমান শাসন-কর্তার কাছে অভিযোগ করলে যে, যীশু রাজদ্রোহ প্রচার করছেন। রোমান শাসনকর্তার বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয় এবং তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। যীশুর অনুগামীরা বিশ্বাস করতো যে, তিন দিন পর যীশু কবর থেকে উঠে আসেন এবং স্বর্গে যান।

যীশুর ধর্ম বা শিক্ষা প্রথম প্রচার হয় প্যালেষ্টাইনে। পরে এই ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস। পরলোকে বিশ্বাসও এই ধর্মের একটি মূল কথা। দরিদ্র জনসাধারণ, দরিদ্র কৃষক ও ক্রীতদাসরা দলে দলে এই ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। এর ফলে রোমান সম্রাটগণ প্রথম দিকে খ্রীষ্টানদের উপর নির্যাতন করেন। এ সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

পরে রোমান সম্রাটরা বুঝতে পারেন যে, খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের ফলে তাঁদের সাম্রাজ্য দৃঢ় হবে। খ্রীষ্টধর্ম কর্তৃপক্ষের নিকট অনুগত

থাকার শিক্ষা দেয়। খ্রীষ্টধর্মের আর একটি শিক্ষা—এই জীবনে দুঃখকষ্ট সহ্য করে কর্তব্য পালন করলে, পরজীবনে স্বর্গে পুরস্কার পাওয়া যাবে। তা ছাড়া সমগ্র সাম্রাজ্যে এই ধর্ম প্রচারিত হলে, সমস্ত সাম্রাজ্যকে এক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যাবে। সুতরাং, সম্রাট কনষ্টানটাইন খ্রীষ্টান ধর্মকে আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করেন। সম্রাট থিওডোসিয়াস্ খ্রীষ্টধর্মকে একমাত্র আইনসঙ্গত ধর্ম বলে ঘোষণা করেন।

চীন

স্যাং বংশ : স্যাং বংশের রাজত্বকালে চীন শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। এই বংশে অনেক রাজা রাজত্ব করেন। কিন্তু প্রাচীন কাহিনীগুলিতে তাদের সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই বংশের এক সম্রাটের নাম ছিল য়ু-ই। তিনি ছিলেন নাস্তিক। তিনি দেবতাদের অবজ্ঞা করতেন। প্রবাদ আছে, তিনি বজ্রাঘাতে মারা যান। এই বংশের শেষ রাজা চৌ-সিন। তিনি খুব অত্যাচারী ও খামখেয়ালী ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও খুব নিষ্ঠুর ছিলেন। রাজা ও রানীর অত্যাচারে ও নিষ্ঠুরতায় অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা বিদ্রোহ করে। চৌ-রাজ্যের লোকেরা এই সময়ে ঐ দেশ আক্রমণ করে এবং এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে।

স্যাং বংশের রাজত্বকালে চীনের অধিকাংশ লোক চাষবাস করতো। তারা গম, যব ও পরবর্তীকালে ধানের চাষ করতো। তারা নিড়ানি ও কাঠের লাঙ্গল ব্যবহার করতো। এতো প্রাচীন-কালেও তারা তুঁতচাষ করতো ও রেশম উৎপন্ন করতো। অনেকে কাঠের কাজ, পাথরের কাজ ও মাটির পাত্র নির্মাণ করতো। তারা বিনিময়-প্রথায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। স্যাং রাজা ছিলেন প্রধান সেনাপতি ও প্রধান পুরোহিত। গোষ্ঠীপতিদের এক পরামর্শ-সভার সাহায্যে তিনি দেশ শাসন করতেন। এই সময়ে সমাজে একটি বংশগত অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই যুগে চীনের লোকেরা লিখতে শিখেছিল।

কনফুসিয়াস্ : প্রাচীন চীনে অনেক জ্ঞানী লোক জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে কনফুসিয়াসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সান্টুং প্রদেশে ৫৫১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কনফুসিয়াসের জন্ম হয়। তিনি খুব প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের তিন বৎসর পর তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ছাত্র-জীবনেই তাঁকে নানারকম কাজ করতে হ'তো, তবুও পড়া ও কাজের ফাঁকে তিনি ধর্মবিদ্যা ও সঙ্গীতে জ্ঞান লাভ করেন।

একুশ বছর বয়সেই তিনি নিজের বাড়িতে বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রধানতঃ ইতিহাস, কাব্য ও আচরণবিধি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁর উপদেশগুলি লিখে যাননি ; সক্রেটিসের মত তিনি মুখে মুখে উপদেশ দিতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞান-পিপাসা জাগাবার চেষ্টা করতেন।

কনফুসিয়াস্ বিলাসিতা বা কৃচ্ছ্রসাধন দুইয়েরই বিরোধী ছিলেন। অনেক বড় বড় লোক তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি কয়েকবার উঁচু রাজপদে নিযুক্ত হন। প্রতিবারই তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন। কিন্তু যে শাসকের নীতি তিনি পছন্দ করতেন না, কখনও তার অধীনে কোন রাজপদ গ্রহণ করতেন না। শেষ জীবনে তিনি চীনের প্রাচীন গ্রন্থগুলির সম্পাদনা ও চীনের প্রাচীন ইতিহাস রচনায় মন দেন। ৭২ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।


কনফুসিয়াস্

কনফুসিয়াসের শিক্ষা : "যা তুমি সত্যিই জান তার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আছে একথা বলা এবং যা তুমি জান না তা স্বীকার করার নামই জ্ঞান"—এই ছিল কনফুসিয়াসের মূল শিক্ষা। জ্ঞান বৃদ্ধি করা বা আত্মোন্নতি করাই সকলের প্রধান

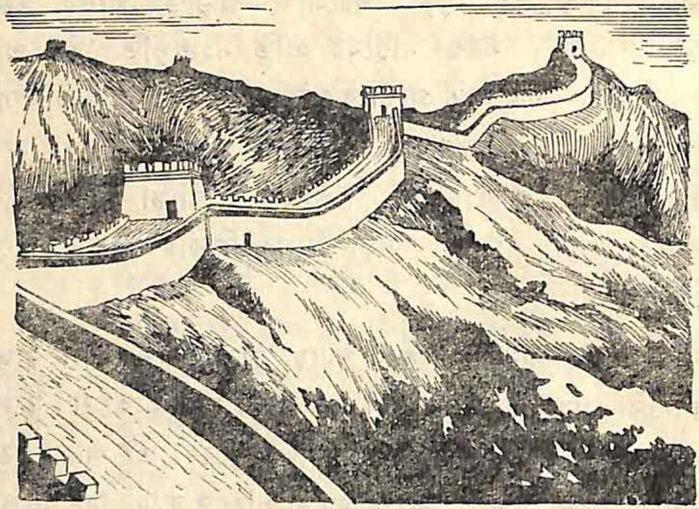
কর্তব্য। বুদ্ধি, সাহস ও সদিচ্ছাই মানুষের প্রধান গুণ। চরিত্রের উন্নতি ও পবিত্রতার উপর তিনি জোর দেন। তিনি প্রাচীন প্রথা ও জাতীয় ধর্মানুষ্ঠানগুলি মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যু, পরলোক প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতেন। সমস্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি ছিল তাঁর প্রধান শিক্ষা। তাঁর মতে প্রত্যেকের উচিত তার নৈতিক চরিত্রের উন্নতি করা এবং আচরণবিধি মেনে চলা। কনফুসিয়াসের মতে প্রজারাই সমস্ত ক্ষমতার মূল। প্রজাদের আস্থা না থাকলে শাসকের পতন ঘটে। কনফুসিয়াসের শিক্ষার প্রভাব চীনে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

চিন বংশ: কনফুসিয়াসের সময়ে চীনে অনেকগুলি রাজ্য ছিল। এরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো। ফলে, সমস্ত দেশে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করতো। এই অরাজকতা দূর করে সমস্ত চীনকে এক সাম্রাজ্যে পরিণত করেন চিন বংশের সি-হং-তি।

সি-হং-তি বারো বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি চীনের ছোট ছোট রাজ্যগুলি জয় করতে আরম্ভ করেন। তিনি চীনের সমস্ত রাজ্যগুলি জয় করেন। মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার কিছু অংশও তাঁর অধিকারে আসে। যুদ্ধের দ্বারা তিনি সমস্ত চীনকে ঐক্যবদ্ধ করেন। সি-হং-তি-ই হলেন চীনের "প্রথম সম্রাট"।

চীনের প্রাচীর: উত্তর দিক থেকে বর্বর জাতিগুলি প্রায়ই চীন আক্রমণ করতো। সি-এদের আক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। চীনের উত্তর সীমান্তে আগে থেকেই কয়েকটা প্রাচীর ছিল। এই প্রাচীরগুলোকে যুক্ত করে এক বিশাল প্রাচীর গড়ে তোলা হয়। এই প্রাচীর ছিল ১,৪০০ মাইলেরও বেশী লম্বা। এই প্রাচীরের মাঝে মাঝে ছিল বড় বড় তোরণদ্বার। অসংখ্য লোক দশ বছর ধরে এই প্রাচীর গড়ে তোলে। মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় জিনিস হ'লো এই চীনের

প্রাচীর। এই প্রাচীরের জন্যই চীন বহু দিন বর্বর জাতিগুলির আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়।



চীনের প্রাচীর

ভারত

আর্যদের আগমন ঃ সিন্ধু-সভ্যতার পর ভারতে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে, তাকে আর্য-সভ্যতা বলা হয়। এই সময় থেকে লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং এই সময় থেকেই ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হয়।

এই সভ্যতা যারা গড়ে তোলে, তাদের আর্য বলা হয়। আর্য একটা ভাষার নাম। যারা এই ভাষায় কথা বলতো, তাদের আর্য জাতি বলা হয়। কেউ কেউ মনে করেন আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ভারত। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতেরা এই মত মানেন না। তাঁদের মতে আর্যরা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে আসার আগে সম্ভবতঃ তারা মধ্য এশিয়া বা দক্ষিণ রাশিয়ায় বাস করতো। তারা প্রথমে আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে; পরে পাঞ্জাবে আসে। আরও পরে তারা সমস্ত উত্তর ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের নাম

অনুসারে হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত আর্যাবর্ত নামে পরিচিত হয়।

আর্যরা এদেশে আসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে। তাদের লক্ষ্য ছিল চাষের জমি ও চারণভূমি। গবাদি পশু জয় করে নেওয়াও ছিল তাদের লক্ষ্য। উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে তারা এদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সম্ভবতঃ ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে তাদের প্রথম দল ভারতে আসে।

বেদ

আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। এই বেদ থেকেই আমরা আর্যদের ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজ সম্বন্ধে জানতে পারি। বেদ কথাটির অর্থ জ্ঞান। কিন্তু বেদ একখানা ধর্মগ্রন্থ নয়। বহু শতাব্দী ধরে এই সাহিত্য গড়ে উঠেছে। বেদ প্রথমে লেখা হ'তো না, মুখে মুখে শেখানো হ'তো। সেই জন্য বেদের আর এক নাম শ্রুতি।

বৈদিক-সাহিত্য সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক ও উপনিষদ—এই তিন ভাগে বিভক্ত। সংহিতার মধ্যে আছে মন্ত্র, স্তোত্র, প্রার্থনা প্রভৃতি। ব্রাহ্মণে স্তোত্রগুলির অর্থ এবং কিভাবে এগুলো প্রয়োগ করতে হবে তা বলা হয়েছে। আরণ্যক ও উপনিষদে আত্মা, ঈশ্বর, পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে অনেক দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। সংহিতাগুলোকে আবার ঋগ্বেদ-সংহিতা, সামবেদ-সংহিতা, যজুর্বেদ-সংহিতা ও অথর্ববেদ-সংহিতা এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক ও উপনিষদকেও এই রকম চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই জন্য সাধারণভাবে বেদকে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ এই চার ভাগে ভাগ করা হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই এই বিশ্বাস চলে আসছে যে, বেদ কোন মানুষের রচনা নয়—ঈশ্বরের বাণী। বেদ বুঝতে হলে ছ'টি বিষয় প্রথমে শিখতে হয়। এদের বলা হয় বেদাঙ্গ।

সমাজ

বৈদিক যুগের সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি : বৈদিক যুগে আর্যরা গ্রামে বাস করতো। ঋগ্বেদে শহরের উল্লেখ নেই। বাপ, মা, ভাই, বোন প্রভৃতি নিয়ে ছিল এক-একটি পরিবার। পিতা ছিলেন পরিবারের প্রধান। পরিবারের সকলের উপর ছিল তাঁর অবাধ কর্তৃত্ব। সমাজে নারীকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হ'তো। নারী ছিল গৃহকর্ত্রী। সংসার পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব ছিল নারীর। নারীরা অবাধে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতে পারতো এবং ভালভাবে সাজগোজ করে উৎসব ও যজ্ঞে যোগ দিতো। তারা লেখাপড়া শিখতো এবং পছন্দমত পতি-নির্বাচন করতে পারতো। সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল না। বিধবারাও বিবাহ করতে পারতো।

আর্যরা যেমন যব, শাকসব্জি প্রভৃতি নিরামিষ আহার গ্রহণ করতো, তেমনি নানারকম আমিষ খাদ্যও তাদের প্রিয় ছিল। মাছ এবং নানারকম পাখী, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, মহিষ ও ষাঁড়ের মাংসও তারা নিয়মিত আহার করতো। দুধ, দই, ঘি, মাখন প্রভৃতিও তাদের প্রিয় ছিল। সুরা ও সোমরস নামক দু'রকম মদও তারা পান করতো। তারা তুলো, পশম ও চামড়ার তৈরী নানা রঙের পোশাক পরতো। মেয়েরা সোনার গহনা পরতো। অনেক সময়ে এই গহনায় দামী পাথর বসানো থাকতো। পুরুষেরাও গহনা পরতো। মেয়েরা চুল আঁচড়ে বেণী বাঁধতো ; নাচ, গান ও উৎসব অনুষ্ঠানে তারা আনন্দ করতো। অবসর সময়ে তারা শিকার, রথের দৌড়, পাশাখেলা প্রভৃতিতে আনন্দ পেতো। এই সময়ে জুয়া খেলারও প্রচলন ছিল।

কৃষিকার্যই ছিল আর্যদের প্রধান কাজ। বলদে-টানা লাঙ্গলের সাহায্যে তারা চাষ করতো। জমিতে জলসেচেরও ব্যবস্থা ছিল। পশুপালনও ছিল তাদের আর একটা প্রধান উপজীবিকা। আর্যদের মধ্যে কিছু লোক তুলো ও পশমের কাপড় তৈরি করতো। ছুতোর মিস্ত্রীরা কাঠের বাড়ি, রথ ও বাড়ির আসবাবপত্র তৈরি করতো। কামাররা সুঁচ, কাস্তে, লাঙ্গলের ফলা, তরবারি, বর্শা প্রভৃতি প্রস্তুত

করতো। স্বর্ণকাররা গহনা তৈরি করতো। কিছু লোক চামড়া দিয়ে নানা রকম জিনিস তৈরি করতো।

আর্যরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতো। মুদ্রা বা মুদ্রার মত বাঁধা দামের ধাতুর টুকরোর প্রচলন ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো বিনিময়-প্রথায়। আর্যরা সম্ভবতঃ সমুদ্রপারের দেশের সাথেও বাণিজ্য করতো। ব্যাবিলন ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সাথে তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা হয়।

ধর্ম : বৈদিক যুগের আর্যরা বহু দেবদেবীর উপাসক ছিল। প্রকৃতির নানা লক্ষণ বা শক্তিকে দেবদেবী মনে করা হ'তো। বেদে এত বেশী দেবদেবীর উল্লেখ আছে যে, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। সমস্ত দেবদেবীকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হ'তো—এরা কেউই ছোট বড় ছিলেন না। দেবদেবীর মধ্যে অগ্নি, সোম প্রভৃতির বিচরণভূমি ছিল পৃথিবী ; ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি বাস করতেন মধ্য নভোমণ্ডলে ; আর মিত্র, বরুণ প্রভৃতি ছিলেন আকাশচারী দেবতা।

দেবদেবীদের তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞ করা হ'তো। দেবতাদের উদ্দেশ্যে অশ্ব, মেষ, ষাঁড় প্রভৃতি বলি দেওয়া হ'তো। যজ্ঞে দুধ, ঘি, নানাবিধ শস্য প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হ'তো। যজ্ঞ করার জন্য অনেক পুরোহিতের প্রয়োজন হ'তো। এঁদের মধ্যে হোতৃগণ মন্ত্র উচ্চারণ করতেন, অধ্বর্যুগণ মন্ত্রপাঠের সাথে সাথে কিছু অঙ্গভঙ্গী করতেন আর উদ্গাতৃগণ সাম গান করতেন।

যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল দেবতাদের কাছে পার্থিব সুখ-সুবিধার জন্য প্রার্থনা করা। যজ্ঞে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হ'তো। দেবতারা খুশী হয়ে মানুষকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দেবেন, এই ছিল যজ্ঞের উদ্দেশ্য। বৈদিক যুগে বহু দেবদেবীর উল্লেখ থাকলেও, এক ঈশ্বর বা ব্রহ্মের কথারও উল্লেখ আছে।

রাজনৈতিক জীবন : বৈদিক যুগে দেশে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য ছিল। অধিকাংশ রাজ্যে রাজারা বংশানুক্রমে রাজত্ব করতেন। কোন কোন রাজ্যে আবার জনসাধারণ প্রধানদের নির্বাচিত করতো ; আর এই প্রধানরাই রাজ্য শাসন করতো।

রাজার মান প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশী। অভিষেক উৎসবের মধ্য দিয়ে তিনি সিংহাসনে বসতেন। তিনি খুব বড় ও সুন্দর বাড়িতে বাস করতেন এবং জমকালো পোশাক পরতেন। রাজা যুদ্ধের সময়ে সৈন্য পরিচালনা করতেন এবং অপরাধীদের বিচার করতেন। প্রজারা স্বেচ্ছায় রাজাকে 'বলি' নামক কর দিতো। পরাজিত শত্রুর কাছ থেকেও কর আদায় করা হ'তো।

প্রধান রাজকর্মচারীদের মধ্যে পুরোহিত, সেনানী ও গ্রামণী ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজারা দূত ও গুপ্তচর নিয়োগ করতেন। এই যুগে সভা ও সমিতি নামে দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এদের সাথে পরামর্শ করেই রাজা রাজ্য শাসন করতেন।

মহাকাব্যের যুগ ঃ ভারতে মহাভারত ও রামায়ণকে মহাকাব্য বলা হয়। কিন্তু মহাকাব্যের যুগ বলে কোন যুগকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়; কারণ রামায়ণ-মহাভারতের সময় নির্ণয় করা যায় নাই। বৈদিক সাহিত্যে মহাভারতের মূল কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যে যুগে যুগে অনেক নতুন কাহিনী যোগ করা হয়েছে। ভারতীয়রা মনে করে যে, ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। কিন্তু সম্ভবতঃ মহাভারত একজনের রচনা নয়। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগে মহাভারত তার বর্তমান রূপ পায় নাই।

রামায়ণ সম্ভবতঃ আরও পরের রচনা। বৈদিক সাহিত্যে রামায়ণের কাহিনীর উল্লেখ নাই। রামায়ণ রচনা করেন বাল্মীকি। মহাভারতে অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু রামায়ণে মূল কাহিনী প্রধানতঃ একটি। রামায়ণের মূল বিষয়বস্তু দক্ষিণ ভারতে আর্য-সভ্যতার বিস্তার। আর্যাবর্তে আর্যদের দুই দলের প্রভুত্ব স্থাপনের সংগ্রামই মহাভারতের প্রধান আলোচ্য। কাব্য হিসাবে এই দুটি গ্রন্থ অতুলনীয়।

মহাকাব্যের যুগে সমাজে চারটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়কুল, পুরোহিতকুল, বণিককুল ও কৃষককুল। এ ছাড়া ছিল শূদ্র ও দাসগণ। মহাকাব্যের যুগে ব্রাহ্মণদের তুলনায় ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এই যুগে জাতিভেদের কঠোরতাও বৃদ্ধি পায়।

এই যুগে বৈদিক দেবদেবীর সাথে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য অনেক নতুন দেবদেবীর পূজার প্রচলন হয়। এই যুগে আর্যদের সমাজে কিছু কিছু অনার্যপ্রথারও প্রচলন হয়। বৈদিক যুগে কোন কোন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকতো, কিন্তু এক স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকতো না। কিন্তু মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের এক স্ত্রী ছিল। সম্ভবতঃ এটি অনার্য প্রথা।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব: বৈদিক যুগের শেষে ধর্ম জটিল হয়ে পড়ে। এই সময়ে পুরোহিতের সাহায্য ছাড়া ধর্মাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে। ধর্মের নামে আচার-অনুষ্ঠানই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। উপনিষদগুলিতেই প্রথমে আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে জ্ঞানকে অনেক বেশী মূল্য দেওয়া হয়। এর ফলে স্বাধীন চিন্তার পথ প্রশস্ত হয়। আর এই স্বাধীন চিন্তার ফলেই জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়।

মহাবীরের জীবনী: জৈনধর্মের শেষ গুরু বা তীর্থঙ্কর মহাবীর নামে পরিচিত। ৫৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বৈশালীর কাছে কুন্দগ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাল্যনাম বর্দ্ধমান। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন এক ধনী ক্ষত্রিয়। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর বয়সে মহাবীর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন।



মহাবীর জৈন

এর পর তিনি নানা জায়গায় ঘুরে কঠোর তপস্যা করেন। কঠোর তপস্যার ফলে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি পরম জ্ঞান লাভ করেন এবং সুখদুঃখের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এই সময় থেকে তাঁর নাম হয় মহাবীর। তিনি জিন বা বিজেতা নামেও পরিচিত হন। আর তাঁর শিষ্যদের বলা হয় জৈন। এর পর তিনি ত্রিশ বছর ধরে

মগধ, অঙ্গ, মিথিলা, কোশল প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচার করেন। ৪৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পাবা নামক স্থানে মহাবীরের মৃত্যু হয়।

মহাবীরের শিক্ষা ঃ মহাবীরের আগে জৈনদের তেইশজন গুরু বা তীর্থঙ্কর ছিলেন। মহাবীরের ঠিক আগের গুরু পার্শ্বনাথ বলতেন—জীবহত্যা ক'রো না, মিথ্যা ব'লো না, সম্পত্তির মালিক হ'য়ো না এবং স্বেচ্ছায় যা দেওয়া না হবে তা গ্রহণ ক'রো না। মহাবীর এগুলোর সাথে আর একটা নতুন উপদেশ যোগ করেন—সৎ জীবন যাপন ক'রো।

জৈনরা বেদকে অভ্রান্ত বলে মনে করেন না। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের উপরও তাদের বিশ্বাস নেই। জৈনরা ঈশ্বর মানে না। তাদের মতে মানুষের মুক্তি ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করে না। বিলাসব্যসন ত্যাগ করে পবিত্র জীবন যাপন করাই মুক্তিলাভের সহজ উপায়। জৈনরা অহিংসার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। তাদের মতে অহিংসা, পবিত্র জীবন যাপন এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা পরম জ্ঞানলাভই মুক্তির প্রধান উপায়।

বুদ্ধের জীবনী ঃ বেদবিরোধী আর একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। গৌতমের অপর নাম সিদ্ধার্থ। ৫৬৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি নেপাল সীমান্তে লুম্বিনী-বনে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন শাক্য-জাতির নির্বাচিত নেতা। উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। তিনি বৈশালী ও রাজগৃহে দুই গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু মুক্তির সন্ধান না পেয়ে তিনি বুদ্ধগয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। অনাহারে তিনি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন। এই সময়ে তিনি সুজাতা নামে এক গোপবালার কাছ থেকে আহার্য গ্রহণ করেন



বুদ্ধদেব

এবং পরম জ্ঞান লাভ করার আগে আসন ত্যাগ করবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করে ধ্যানে মগ্ন হন। অবশেষে তিনি বোধি বা পরম জ্ঞান লাভ করেন। এই সময় থেকে তাঁর নাম হয় বুদ্ধ বা জ্ঞানী। যে গাছের তলায় বসে তিনি বোধি লাভ করেন, সেই গাছ বোধিবৃক্ষ নামে পরিচিত।

বুদ্ধ কাশীর কাছে সারনাথে পাঁচজন সন্ন্যাসীর কাছে প্রথম উপদেশ দান করেন। এই ঘটনাকেই বলা হয় ধর্মচক্রপ্রবর্তন। এর পর তিনি রাজগৃহ, গয়া, নালন্দা, পাটলিপুত্র, কোশল প্রভৃতি জায়গায় ধর্মপ্রচার করেন। মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁর শিষ্য হন। ৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আশি বছর বয়সে বুদ্ধ কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন।

বুদ্ধের শিক্ষা: বুদ্ধ চারটি আর্যসত্যের কথা বলেছেন—(১) পৃথিবী দুঃখে পূর্ণ। (২) কামনা-বাসনাই পৃথিবীতে জন্মলাভের কারণ। (৩) কামনা-বাসনা শেষ হলেই জন্মলাভের হাত হতে মুক্তি পাওয়া যায়। (৪) কামনা-বাসনার অবসান ঘটানোর একটা পথ বা উপায় আছে।

এই উপায় বা পথের নাম অষ্টাঙ্গিক মার্গ। অষ্টাঙ্গিক মার্গের আর এক নাম মধ্যপন্থা। আরাম ও বিলাস বা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন এর কোনটাই ভাল নয়। সুতরাং মানুষের উচিত মধ্যপন্থা অনুসরণ করা।

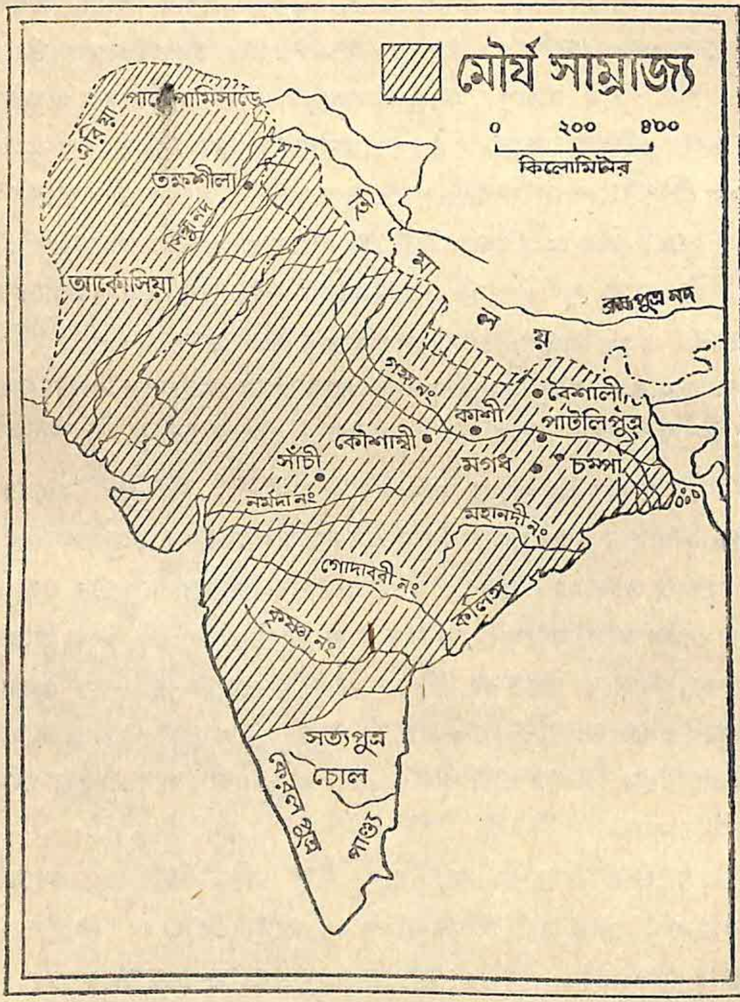
বুদ্ধের মতে, মানুষ নিজেই তার ভাগ্য ঠিক করে। ভাল কাজ করলে পরজন্মে উন্নততর জীবন লাভ করবে। এইভাবে ক্রমে মানুষ নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করতে পারে। আবার খারাপ কাজ করলে মানুষ নীচজন্ম লাভ করবে এবং তার নির্বাণ লাভের সম্ভাবনা পিছিয়ে যাবে।

বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কতকগুলি শীল বা নীতি মেনে চলতে বলেছেন। তাঁর মতে, পরনিন্দা, পরের দ্রব্যে লোভ ও বিলাসিতা অন্যায়। অহিংসা ও সর্বজীবে প্রেম ও দয়া বৌদ্ধধর্মের মূলকথা।

বুদ্ধ বেদকে অভ্রান্ত বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে, যাগযজ্ঞ নিরর্থক। তিনি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতিভেদ মানতেন না। ঈশ্বর আছেন বা নেই, এ প্রশ্নের আলোচনা বুদ্ধ করতেন না। কিন্তু তিনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

সাম্রাজ্যের কাহিনী : বৈদিক যুগে উত্তর ভারতে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য ছিল। মহাবীর ও বুদ্ধের যুগে ছিল ষোলোটি বড় রাজ্য। এই রাজ্যগুলির মধ্যে মগধই সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

মৌর্য সাম্রাজ্য : নন্দরাজকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আনুমানিক ৩২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।



মোরীয় নামক ক্ষত্রিয়কুলে তাঁর জন্ম হয়। চাণক্য বা কৌটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি নন্দরাজকে পরাজিত করেন। এর অল্প দিন আগে ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার প্রায় সমস্ত

পাঞ্জাব জয় করেন। আলেকজাণ্ডারের ভারতত্যাগ ও মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের বিতাড়িত করে পাঞ্জাব দখল করেন।

আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস পাঞ্জাব পুনরধিকারের জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁর সাথে চন্দ্রগুপ্তের সন্ধি হয়। সন্ধিতে চন্দ্রগুপ্ত কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বেলুচিস্তানের এক অংশ লাভ করেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে ৫০০ হাতি উপহার দেন। এর পর চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতে সুরাষ্ট্র ও কাথিওয়াড় জয় করেন এবং দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। এইভাবে চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এই সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে পারস্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বে মগধ ও বাংলা, পশ্চিমে সুরাষ্ট্র ও দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের সময়েও এই সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে।



অশোক

অশোক ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। ২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পিতা বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক রাজা হন। তিনি শক্তিশালী কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। কলিঙ্গ-যুদ্ধে বহু লোকের মৃত্যু ও দুঃখ-দুর্দশা দেখে অশোকের মনে অনুশোচনা হয়। তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি আর যুদ্ধ করবেন না। তিনি এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্ম প্রচারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি ভারতে ও ভারতের বাইরেও এই ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হয়। অশোক প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অনেক জনহিতকর কাজ করেন। ২৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। অশোকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

কুষাণ সাম্রাজ্য ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল গ্রীক, পার্থিয়ান, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির অধীনে আসে। এই বিদেশী জাতিগুলির মধ্যে কুষাণদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুষাণরা ইউ-চি জাতির শাখা। তারা চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে বাস করতো। হূনদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তারা বক্ষুয়ায় আসে ও শকদের পরাজিত করে। এইখানে ইউ-চি জাতি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। কুষাণ শাখার নেতা কুজলু কদফিস্ ইউ-চি জাতির পাঁচটি শাখাকে ঐক্যবদ্ধ করে কাবুল ও কাশ্মীর অধিকার করেন। কুজলু কদফিসের পুত্র ভীম কদফিস্ উত্তর ভারতের কিছু অংশ জয় করেন। এইভাবে ভারতে কুষাণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

ভীম কদফিসের পর কণিষ্ক কুষাণদের রাজা হন। তিনি ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। ভীম কদফিসের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল তা জানা যায় না। সম্ভবতঃ ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কণিষ্ক সিংহাসনে বসেন।

কণিষ্ক অনেক দেশ জয় করেন। পেশোয়ার থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ তিনি মগধও জয় করেন। সিন্ধুদেশ, মালব, রাজপুতানা ও কাথিওয়াড় তাঁর অধিকারে আসে। পেশোয়ারের পুরুষপুরে ছিল তাঁর রাজধানী। ভারতের বাইরেও তিনি বহু দেশ জয় করেন। তিনি পার্থিয়ানদের রাজাকে পরাজিত করেন এবং মধ্য এশিয়ার খাসগড় খোটান ও ইয়ারখন্দ জয় করেন। এইভাবে কণিষ্ক ভারতে ও ভারতের বাইরে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। শেষ জীবনে কণিষ্ক চীন-সম্রাট হো-টির সেনাপতি পান-চাও-এর কাছে পরাজিত হন।

কণিষ্ক 'দেবপুত্র' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং পেশোয়ারে এক বিশাল বিহার নির্মাণ করেন। তিনি বৌদ্ধ হলেও অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তিনি পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়ে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। কণিষ্কের

পর বশিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব কুষাণদের রাজা হন। এই সময় থেকে কুষাণ সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যেই কুষাণ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যঃ চতুর্থ শতকের প্রথমে মগধে আর একটি সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। গুপ্তবংশের রাজারাই এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। গুপ্তবংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজার নাম শ্রীগুপ্ত। তিনি 'মহারাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি ও তাঁর পুত্র খুব বড় রাজা ছিলেন না। কিন্তু শ্রীগুপ্তের পৌত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে এই রাজবংশ প্রাধান্য লাভ করে।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ থেকে ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। এর থেকে মনে করা হয়, চন্দ্রগুপ্ত ক্ষুদ্র পৈতৃক রাজ্যকে একটা বড় রাজ্যে পরিণত করেন। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিবংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য কত বড় ছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে অনেক পণ্ডিতই মনে করেন যে, অযোধ্যা, প্রয়াগ ও মগধ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।



সমুদ্রগুপ্ত

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর এক সভাসদ হরিষেন তাঁর কীর্তিকাহিনী এলাহাবাদে এক অশোকস্তম্ভের গায়ে খোদিত করে যান। এর থেকে তাঁর বীরত্বের কাহিনী জানা যায়। সিংহাসনলাভের পর সমুদ্রগুপ্ত রাজ্যজয়ে ব্রতী হন। উত্তর ভারতে তিনি অনেক রাজাকে পরাজিত করেন এবং তাঁদের রাজ্য অধিকার করে নেন। উত্তর ভারতে আরও

অনেক রাজা স্বেচ্ছায় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন ও তাঁকে কর দেন। এর পর সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতে অভিযান করেন এবং কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হন। দক্ষিণ ভারতে তিনি অন্ততঃ বারোজন রাজাকে পরাজিত করেন। এই সব রাজারা সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করলে, সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের রাজ্য আবার ফিরিয়ে দেন।

সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিজে বা কর্মচারীদের সাহায্যে শাসন করতেন। এই অঞ্চলের পূর্বে ও পশ্চিমে অনেকগুলি রাজ্য তাঁকে কর দিতো। অনেক দূরের শক ও কুষাণ রাজারাও তাঁকে বড় বলে মেনে নিতো। এ ছাড়া দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার বারোজন রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতেন। প্রাচীন দিগ্বিজয়ী রাজাদের মত তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সমুদ্রগুপ্ত কবি ও সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর সভায় অনেক গুণীজ্ঞানী সমাদর পেতেন। সুপণ্ডিত বসুবন্ধু ছিলেন তাঁর একজন মন্ত্রী। তাঁর সভাসদ ও সভাকবি হরিষেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যকে আরও বড় করেন। তিনি পশ্চিম ভারতে গুজরাট ও কাথিওয়াড় জয় করেন। সম্ভবতঃ তিনি সমস্ত বাংলাদেশও জয় করেন। ফলে, বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সভায় ছিলেন ন'জন বিখ্যাত পণ্ডিত। এঁদের 'নবরত্ন' বলা হ'তো। এঁদের মধ্যে মহাকবি কালিদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ে হূন নামে মধ্য এশিয়ার এক বর্বর জাতি গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত হূনদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। হূনদের এতো বেশী ক্ষয়ক্ষতি হয় যে, তারা আর পঞ্চাশ বছর গুপ্ত-

সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি। স্কন্দগুপ্ত দেশকে মারাত্মক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। ফলে, তাঁর জয়গান লোকের মুখে মুখে ফিরতো। ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর বার বার গৃহযুদ্ধে গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল রাজাদের সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা একে একে স্বাধীন হয়ে যায়। আবার হূন আক্রমণ আরম্ভ হয়। ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

প্রাচীন বাংলার কাহিনী ঃ বাংলার সভ্যতা খুব প্রাচীন। বর্ধমান জেলায় পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে খননকার্য চালিয়ে পণ্ডিতেরা জানতে পেরেছেন যে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন বা চার হাজার বছর আগে বাংলার লোকেরা একটা উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তারা তামা ও লোহার ব্যবহার জানতো এবং ইউরোপের অনেক দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। তারা ইটের ও পাথরের ভিত্তির উপর বড় বড় বাড়ি তৈরি করতো। তারা কৃষিকার্যে ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও যথেষ্ট উন্নতি করেছিল।

যারা এই সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তারা ছিল অনার্য। আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতায় বাংলা বা তার কোন অংশের উল্লেখ নেই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদের অর্থাৎ উত্তর বাংলার অধিবাসীদের 'দস্যু' বলা হয়েছে। বৌধায়ণের ধর্মসূত্রেও পুণ্ড্র ও বঙ্গকে অপবিত্র দেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং পণ্ডিতেরা মনে করেন বৈদিক যুগের শেষের দিকেও বাংলায় আর্যদের প্রভাব খুব কমই ছিল।

কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের যুগে বাংলায় আর্যদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। রামায়ণে বলা হয়েছে যে, বঙ্গ ছিল দশরথের সাম্রাজ্যভুক্ত। মহাভারতে বাংলার অনেকগুলি রাজ্যের উল্লেখ আছে। কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমসেন বাংলার অনেক রাজ্য জয় করেন। পুণ্ড্রদের রাজা পুণ্ড্রক বাসুদেব খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি কৃষ্ণের হাতে নিহত হন। বাংলার রাজারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যোগদান করেন।

আচারঙ্গ সূত্র ও অন্যান্য জৈনগ্রন্থে রাঢ়, বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলের উল্লেখ আছে। দিব্যাবদান, মিলিন্দ, পাঞ্চহো প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে পুণ্ড্রবর্দ্ধন, রাঢ়, বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থ হ'তে জানা যায় যে, ঐ সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রচার ঘটেছে।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে বাংলা সম্বন্ধে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। গ্রীক ও রোমান লেখকদের মতে, গঙ্গারিডি ও প্রাসিয়য়-এর রাজা বা রাজাদের ভয়েই আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা আর পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে সাহসী হয়নি। পণ্ডিতদের মতে, গঙ্গারিডি জাতি বাংলারই অধিবাসী। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে বাংলা শক্তিশালী রাজ্য ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে সম্ভবতঃ বাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়—যদিও এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর কিছুদিন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে বাংলায় দুটি শক্তিশালী রাজ্যের কথা জানতে পারা যায়। এর একটির নাম পুষ্করণ ও অপরটির নাম সমতট। বাঁকুড়ার কাছে শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে খোদিত লিপিতে পুষ্করণের রাজা সিংহবর্মা ও তাঁর পুত্র চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে। সমুদ্রগুপ্ত পুষ্করণের এই চন্দ্রবর্মাকেই পরাজিত করেন। সমতটের রাজাও সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেন। সমুদ্রগুপ্তের পর বাংলার অন্যান্য অংশের উপরও গুপ্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলায় গৌড় ও বঙ্গ নামে দু'টি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়।

বিদেশের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগঃ অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সাথে বাইরের জগতের যোগাযোগ ছিল। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ভারতীয়রা মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। পরবর্তী কালেও ভারতের সাথে বাইরের জগতের সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। মৌর্যযুগে অশোক সিরিয়া, মিশর,

গ্রীস প্রভৃতি দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠান। এর ফলে ভারতের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এছাড়া প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয়রা নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সব দেশ ক্রমে ভারতীয়দের অধিকারে আসে। তারা এই সব দেশে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সব দেশে এই সময়ে ভারতীয় ধর্ম, আচার-ব্যবহার, ভাষা ও শিল্পের প্রচলন হয়।

এই সব উপনিবেশের ধ্বংসাবশেষ দেখলে মনে হয় এগুলি যেন কোন ভারতীয় শহরেরই ধ্বংসাবশেষ। এ ছাড়া অনেক দেশে এখনো ভারতীয় ভাষা, ধর্ম ও রাজনীতির প্রচলন আছে। এসব দেশকে ভারতের অংশ বলেই মনে হয়। এই দেশগুলির মধ্যে মধ্য-এশিয়া, সিংহল, তিব্বত প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মৌর্য যুগে মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে গ্রীক, শক, পার্থিয়ান প্রভৃতি জাতি এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। এদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করে এবং ভারতীয় ভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহার করে।

মধ্য-এশিয়ায় কাশগড়, ইয়ারকন্দ ও খোটানে কতকগুলি ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার প্রচলন হয়। এই সব জায়গায় কাঠ, চামড়া, কাগজ ও রেশমী কাপড়ে লেখা অনেক দলিলপত্র পাওয়া গেছে। এই সব দলিলে অনেক ভারতীয় নামের উল্লেখ আছে।

খোটান ভারতীয় সভ্যতার একটা বড় কেন্দ্র ছিল। এখানে মহারাজা রাজাধিরাজ দেববিজিত সিংহ নামে এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। খোটানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং এখানে ভারতীয় রাজারা অনেক দিন রাজত্ব করেন। খোটান বৌদ্ধধর্মের একটা বড় কেন্দ্র ছিল। এখানকার গোমতি বিহার ছিল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার একটা প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

কুচি বা আধুনিক কুচ ছিল ভারতীয় সভ্যতার একটা বড় কেন্দ্র। এখানকার প্রাচীন রাজারা ছিলেন ভারতীয়। এখানে বড় বড় বৌদ্ধ-বিহার ছিল। এখানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের ভাল ব্যবস্থা ছিল।

এ দেশের নাম ছিল অগ্নিদেশ। এখানে ইন্দ্রার্জুন, চন্দ্রার্জুন প্রভৃতি নামের রাজারা রাজত্ব করতেন।

এই সব অঞ্চলে অনেক প্রাকৃত ও সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গেছে। এখানে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এখানের মঠ-মন্দিরগুলোর গঠনের সাথে ভারতের মঠ-মন্দিরের অনেক মিল আছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে এখানে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

পূর্ব এশিয়ার অনেক অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। জাভা, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপে অনেকগুলো ভারতীয় রাজ্য গড়ে ওঠে। পশ্চিম জাভায় পূর্ণবর্মন নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। পূর্ব জাভায় সঞ্জয় একটা শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। সুমাত্রায় শ্রীবিজয় নামে এক রাজ্য স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে এই রাজ্যগুলি গড়ে ওঠে। ইন্দোচীনের আনাম অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে একটা হিন্দুরাজ্য গড়ে ওঠে। এই রাজ্যের নাম ছিল চম্পা। কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ কাম্বোডিয়ায় ফু-নান নামে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মদেশেও ভারতীয়রা রাজ্য স্থাপন করে।

সিংহলের মহাবংশ থেকে জানা যায় যে, বাংলার বিজয়সিংহ সিংহল জয় করেন। কিন্তু এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তিব্বতের ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে জানা যায় যে, তিব্বতের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের এক রাজপুত্র।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশী ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এখানে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্র পড়ার ব্যবস্থা ছিল। এই অঞ্চলে জনসাধারণ ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করে। শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্মই ছিল প্রধান ধর্ম। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ছিল। এই সব জায়গায় বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। ভারতের প্রভাবে এই সব অঞ্চলে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন হয়। ভারতের মতই এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার জাতি ছিল। এখানকার প্রথম দিকের মন্দির ও মূর্তিগুলি ভারতীয় রীতিতেই

তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি ভারতীয় শিল্পীরাই তৈরি করেছে। পরে অবশ্য এই সব দেশে নিজস্ব শিল্পরীতি গড়ে উঠেছে।

মৌর্য ও কুষাণ যুগে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে ভারতে অনেক বাণিজ্যপথ গড়ে ওঠে। তক্ষশীলার পথে ভারতের সাথে পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য চলতো। মৌর্যযুগে পাটলিপুত্র ও তক্ষশীলার মধ্যে একটি রাজপথ তৈরি হয়। তক্ষশীলা থেকে কাবুল পর্যন্ত একটা বড় রাজপথ ছিল। সেখান থেকে বক্ত্রিয়া হয়ে একটা পথ যায় কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত। আর একটা পথ কান্দাহার ও হিরাট হয়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলির সাথে যুক্ত হয়। মধ্য এশিয়া ও ভারতের মধ্যেও বাণিজ্যপথ স্থাপিত হয়। ভারতীয় বণিকরা খাসগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান, কুচি প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্য-ঘাঁটি স্থাপন করে। এই পথে চীনের সাথেও ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। চীন থেকে ভারতে রেশমী কাপড় আমদানি হ'তো। রোমের বণিকদের সাথেও ভারতীয় বণিকরা ব্যবসা করতো। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতের লাভজনক বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। এখান থেকে মসলা এনে তারা রোমানদের কাছে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করতো।

এই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে ভারতের ধনবৃদ্ধি হয়। সমাজে বণিকদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে বণিকসংঘগুলি যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল।

প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বিদেশীদের বিবরণ—মেগাস্থিনিস: প্রাচীনকালে ভারতের সাথে অনেক দেশের যোগাযোগ ছিল। এই সব দেশ থেকে অনেক ভ্রমণকারী এদেশে আসেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ দেশের সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ রেখে গেছেন, এঁদের মধ্যে মেগাস্থিনিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাথে সেলুকাসের সন্ধির পর মেগাস্থিনিস সেলুকাসের দূত হয়ে চন্দ্রগুপ্তের সভায় অনেক দিন বাস করেন। তিনি এ দেশের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে এক সুন্দর বিবরণ রেখে গেছেন। মেগাস্থিনিস বলেছেন, ভারত উর্বর দেশ। বহু নদী এই দেশকে উর্বর করেছে। বছরে দু'বার বৃষ্টিপাতের ফলে জমিতে দু'বার প্রচুর

ফসল পাওয়া যায়। এখানে নানারকমে শস্য ও সুস্বাদু ফল জন্মে। এখানে সোনা, রূপা, লোহা, তামা প্রভৃতি নানারকমের ধাতুও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং জনসাধারণের অবস্থা এখানে সচ্ছল। মেগাস্থিনিসের মতে, ভারতে কখনো দুর্ভিক্ষ হয় না। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ অন্যান্য অনেক বই-এ দুর্ভিক্ষের কথা জানা যায়। এই সময়ে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

এই সময়ে ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করতো। কৃষিকার্যই ছিল তাদের জীবিকার প্রধান উপায়। কিন্তু এই সময়ে ভারতে অনেক শহর গড়ে উঠেছিল। মেগাস্থিনিসের মতে, চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রই ছিল ভারতের সবচেয়ে বড় শহর। এই শহর দৈর্ঘ্যে ছিল সাড়ে ন'মাইল ও প্রস্থে পৌনে দু'মাইল। এর চারপাশে প্রশস্ত পরিখা ও উঁচু প্রাচীর ছিল। পাটলিপুত্রে পৌর-শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ত্রিশজনের একটা সমিতি এই শহরের শাসন চালাতো। এরা ছয়টি উপসমিতিতে বিভক্ত হয়ে কাজ করতো।

মেগাস্থিনিস বলেছেন, ভারতে সাতটি জাতি ছিল। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কারণ ভারতে বহুদিন থেকেই চারটি জাতির কথা জানা যায়। সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিস পেশা ও জাতিকে এক বলে মনে করেছেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই সময়ে জাতিভেদ আগের চেয়ে কঠোর হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে।

সমাজের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, ভারতে কোন ক্রীতদাস ছিল না। মেগাস্থিনিসের এই মতও ঠিক নয়। ভারতে দাসদের উপর খুব ভাল ব্যবহার করা হ'তো। তার থেকেই বোধ হয় মেগাস্থিনিসের ধারণা হয়েছে যে, ভারতে দাসত্ব প্রথা ছিল না।

মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, ভারতীয়রা সরল জীবন যাপন করতো। চোর, ডাকাত দেশে ছিল না বললেই চলে। উৎসবের সময় ছাড়া ভারতীয়রা মদ্যপান করতো না। লোকে মামলা-মকদ্দমা বেশী করতো না। ভারতীয়রা সুন্দর পোশাক ও সোনার

গহনা পরতো। ধনীদের মধ্যে সুন্দর মসলিন কাপড় ও দামী পাথর বসানো সোনার গহনার প্রচলন ছিল।

দেশের আইন ছিল কঠোর। গুরুতর অপরাধ করলে হাত-পা কেটে ফেলা হ'তো। কোন কোন অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'তো। মৌর্য যুগে পুরুষের বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা সাধারণতঃ অন্তঃপুরে থাকতো। কিন্তু মেগাস্থিনিস বলেছেন, পাণ্ড্যরাজ্যে মেয়েরা শাসনকার্যে নিযুক্ত হ'তো। কিন্তু এই যুগে মেয়েদের স্বাধীনতা আগের চেয়ে অনেক কম ছিল।

ফা-হিয়েন ঃ চীন থেকে বৌদ্ধ তীর্থ দেখতে ভারতে আসেন ফা-হিয়েন। তিনি যখন ভারতে আসেন তখন মগধে রাজত্ব করছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ফা-হিয়েন প্রায় দশ বছর ভারতে ছিলেন। তিনি গান্ধার হয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। তারপর নানা জায়গা ভ্রমণ করে বাংলার তাম্রলিপ্ত বন্দরে আসেন। এখান থেকে তিনি সমুদ্রপথে দেশে ফিরে যান।

ফা-হিয়েন ছিলেন বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী, তিনি এদেশের ধর্ম ও সমাজ-জীবনের একটি সুন্দর বিবরণ রেখে গেছেন। কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলেননি। তিনি পাটলিপুত্রে প্রায় তিন বছর বাস করেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম পর্যন্ত কোথাও উল্লেখ করেননি।

তিনি বলেছেন, দেশে লোকসংখ্যা ছিল প্রচুর। তারা সুখে-শান্তিতে বাস করতো। সরকারের কাছে তাদের বাড়ি-ঘরের তালিকা দিতে হ'তো না। সরকারী কর্মচারীদের কাছে তাদের হাজির হতে হ'তো না। শুধু যারা সরকারের খাস জমি চাষ করতো, তাদেরই শুধু ঐ জমির ফসলের এক অংশ সরকারকে দিতে হ'তো। সাধারণ লোকের উপর কোন বিধিনিষেধ ছিল না। তারা ইচ্ছামত যে কোন জায়গায় থাকতে বা যেতে পারতো। দণ্ডবিধি আদৌ কঠোর ছিল না। অধিকাংশ অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। এই সময়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'তো না। একমাত্র বার বার বিদ্রোহ করলে ডান হাত কেটে ফেলে শাস্তি দেওয়া হ'তো।

এই সময়ে জনসাধারণের অধিকাংশই নিরামিষ আহার করতো।

তারা সাধারণতঃ মাংস, পেঁয়াজ বা রসুন খেতো না। বাজারে মদের দোকান খোলাও তারা পছন্দ করতো না। চণ্ডালরা ছিল অস্পৃশ্য। তারা আলাদা জায়গায় বাস করতো এবং শিকার করে জীবজন্তুর মাংস খেতো। পথিকদের সুবিধার জন্য পথের ধারে বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হ'তো। জনসাধারণের অবস্থা সচ্ছল ছিল। চুরি ডাকাতি খুব কমই হ'তো।

বাংলা, পাঞ্জাব ও মথুরায় বৌদ্ধধর্মের খুব প্রসার ছিল। পাটলিপুত্রে দুটি বড় বড় সুন্দর মঠ বা বিহার ছিল। এর প্রত্যেকটিতে ছয় সাত হাজার করে সন্ন্যাসী থাকতো। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজ করতো এবং জনসাধারণ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতো।

প্রাচীন ভারতের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিক্ষার অগ্রগতি—
শিল্প ও স্থাপত্য: সিন্ধু-সভ্যতার পর থেকে মৌর্য যুগ পর্যন্ত ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মৌর্যসম্রাট অশোকের সময়ে শিল্প ও স্থাপত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। অশোকের সময়ে অনেক সুন্দর সুন্দর স্তূপ নির্মিত হয়। এদের মধ্যে সাঁচিস্তূপ সবচেয়ে বিখ্যাত। অশোক অনেক সুন্দর-ভাবে পালিশ করা পাথরের স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এদের মধ্যে সারনাথের স্তম্ভ ও তার মাথায় চারটি সিংহের মূর্তি যেমন জমকালো তেমন সুন্দর। এই সময়ে অনেক পাথরের গুহাগৃহও তৈরি হয়। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় পাটলিপুত্রে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ছিল। ফা-হিয়েন অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে বলেছিলেন যে,



অজন্তার গুহাচিত্র

এতো বড় ও এতো সুন্দর প্রাসাদ কোন মানুষের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়—অশোক নিশ্চয়ই দানবের সাহায্যে এই প্রাসাদ তৈরি করেন।

কুষাণ যুগে এক নতুন ধরনের শিল্পরীতির প্রচলন হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গান্ধার শিল্পরীতির প্রচলন হয়। এই যুগে অনেক সুন্দর সুন্দর বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়। কিন্তু এই মূর্তিগুলো গ্রীক দেবদেবীর আদর্শে তৈরি—দেখতে গ্রীক মূর্তির মতো। গুপ্ত যুগকে শিল্পের 'সুবর্ণ যুগ' বলা চলে। এই যুগের অধিকাংশ মন্দির ও অট্টালিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু দেওঘর, বিথারগাঁও প্রভৃতি জায়গায় দু'একটি মন্দির এখনো বর্তমান। গুপ্তযুগের স্থাপত্য যে কত উন্নত ছিল, এগুলো থেকে তা জানা যায়। গুপ্তযুগে মূর্তি-নির্মাণ শিল্পের অসাধারণ উন্নতি হয়। এই যুগের মূর্তিগুলির উপর কোন বিদেশী প্রভাব ছিল না। এই যুগের মূর্তিগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক। এদের সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। গুপ্তযুগে চিত্র-শিল্পেরও উন্নতি ঘটে। অজন্তা ও বাঘগুহার কতকগুলি চিত্র গুপ্তযুগেই অঙ্কিত হয়।

সাহিত্য ঃ ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ। ধর্মই এই সাহিত্যের বিষয়বস্তু। বৈদিক সাহিত্যের পর রামায়ণ ও মহাভারতের কথা উল্লেখ করতে হয়। এর পর রচিত হয় মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র। কণিষ্কের সময়ের বিখ্যাত কবি অশ্বঘোষ। তাঁর রচিত বুদ্ধচরিত একখানি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

কিন্তু গুপ্তযুগেই সংস্কৃত সাহিত্যের চরম উন্নতি হয়। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার ছিলেন মহাকবি কালিদাস। তাঁর লেখা শকুন্তলা নাটক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম। মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশী নামে তাঁর আরও দু'খানি সুন্দর নাটক আছে। কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ নামে দু'খানা মহাকাব্য তাঁকে অমর করে রেখেছে। তাঁর লেখা মেঘদূত পৃথিবীর একখানা শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা। কালিদাসের ভাবের গভীরতা ও ভাষার মাধুর্যের তুলনা হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোন লেখকই কালিদাসের মত সুন্দর উপমা প্রয়োগ করতে পারেননি।

কালিদাস ছাড়া কিরাতার্জুনীয়ম্-এর লেখক ভারবি এবং মৃচ্ছকটিকম্-এর রচয়িতা শূদ্রকও এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন। মুদ্রারাক্ষসের লেখক বিশাখদত্তও সম্ভবতঃ এই যুগের লেখক ছিলেন। এই যুগে গদ্য সাহিত্যেরও উন্নতি ঘটে। এই যুগে দণ্ডী দশকুমার-চরিত রচনা করেন। এই যুগে কাত্যায়ন, দেবল প্রভৃতি লেখকগণ কয়েখানি ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেন।

শিক্ষা ঃ প্রাচীন ভারতে ছাত্ররা গুরু-গৃহে শিক্ষালাভ করতো। এখানে তারা ব্যাকরণ, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়তো। প্রাচীন ভারতে তক্ষশীলা প্রভৃতি কয়েকটি শহর ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। এদের বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে। তক্ষশীলায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়ই পড়ানো হ'তো। রাজনীতি, অর্থনীতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। ঔষধবিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল তক্ষশীলা। বিভিন্ন দেশ হতে ছাত্ররা এখানে পড়তে আসতো। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত তক্ষশীলাই ছিল ভারতের প্রধান শিক্ষার কেন্দ্র।

নালন্দা ছিল আর একটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে উচ্চশিক্ষার জন্য বহু ছাত্র এখানে আসতো। সপ্তম শতকে চীনের পরিব্রাজক হিউ-য়েন সাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—দশ হাজার ছাত্র এখানে পড়াশুনা করতো। এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র, বেদ, তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, ঔষধবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি পড়ানো হ'তো। একশো বেদী থেকে প্রত্যেক দিন পড়ানো হ'তো। বহু রাজা এখানে বড় বড় বাড়ি তৈরি করে দেন এবং এখানকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। একশোটি গ্রামের রাজস্ব থেকে এখানকার সমস্ত খরচ চলতো। কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হ'তো। এখানকার ছাত্রদের সুনাম এশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঃ প্রাচীন ভারতে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ঔষধবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটে। গুপ্তযুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্রের কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের লেখকগণ গ্রীসের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সাথে

পরিচিত ছিলেন। এই সমস্ত পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আর্যভট্ট। গণিতশাস্ত্রের অনেক নতুন তত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করেন। তিনি পৃথিবীর আহ্নিক গতি আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর ছায়া চাঁদের পরে পড়ার ফলে যে চন্দ্রগ্রহণ হয়, সে তথ্যও আর্যভট্ট আবিষ্কার করেন। গণিতশাস্ত্রের দশমিক চিহ্নের ব্যবহারও আর্যভট্টের আবিষ্কার।

এই যুগের আর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বরাহমিহির। তাঁর পঞ্চসিদ্ধান্তিকা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ। জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর তাঁর লেখা বৃহৎসংহিতা আজও একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়।

এই যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রেরও বিশেষ উন্নতি হয়। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ চরকসংহিতা। এই গ্রন্থের লেখক চরক সম্ভবতঃ কণিষ্কের যুগে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের আর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম শুশ্রুতসংহিতা। এই গ্রন্থের লেখক শুশ্রুত সম্ভবতঃ চতুর্থ শতকের পুর্বেই তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন ভারতে পদার্থবিজ্ঞানের ও রসায়নবিজ্ঞানেরও প্রভূত উন্নতি ঘটে।

অনুশীলনী

গ্রীস

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ক্রীটের সভ্যতার বিবরণ দাও।

২। হোমারের যুগের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

৩। প্রাচীন গ্রীকগণ কেন উপনিবেশ স্থাপন করে? উপনিবেশ স্থাপনের ফল বর্ণনা কর।

৪। স্পার্টার শাসনব্যবস্থা ও সমাজজীবন বর্ণনা কর।

৫। সোলোনের সংস্কারগুলির বিবরণ দাও।

৬। পেরিক্লিসের শাসনকালে অ্যাথেন্সের সাহিত্য, শিল্প ও ধর্মের উন্নতির বিবরণ দাও।

৭। সক্রেটিস্ সম্বন্ধে কি জান ?

৮। আলেকজাণ্ডারের রাজ্যজয়ের বিবরণ দাও।

(খ) অল্প কথায় উত্তর দাও ঃ

১। ইলিয়াড ও ওডেসী সম্বন্ধে কি জান ?

২। ম্যারাথন ও থার্মপইলির যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান ?

৩। ডেলসের রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে কি জান ?

৪। পেলোপনেসাসের যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান ?

(গ) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। স্পার্টার প্রাচীন নিয়মকানুনগুলি কে রচনা করে ?

২। গ্রীসে কাকে ইতিহাসের জনক বলা হয় ?

৩। কার উপর পার্থেননের নির্মাণের ভার দেওয়া হয় ?

৪। আলেকজাণ্ডারের পিতার নাম কি ?

রোম

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। রোম নগরী প্রতিষ্ঠার কাহিনী বর্ণনা কর।

২। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের বিবরণ দাও।

৩। প্লেবিয়ানদের কি কি অভিযোগ ছিল ? কি ভাবে এইগুলির প্রতিকার হয় ?

৪। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস-বিদ্রোহ সম্বন্ধে কি জান ?

৫। জুলিয়াস সিজার কি ভাবে ক্ষমতালাভ করেন ? সিজারের শাসন কিরূপ ছিল ? তিনি কি কি সংস্কার প্রবর্তন করেন ?

৬। কেন এবং কি ভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে ?

৭। খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে কি জান ?

(খ) অল্প কথায় উত্তর দাও ঃ

১। কারা কার্থেজের প্রতিষ্ঠা করে ? কার্থেজের সাথে রোমের যুদ্ধকে পিউনিক যুদ্ধ কেন বলা হয় ?

২। তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান ?

৩। রোমান নাগরিকরা কি কি অধিকার ভোগ করতো ?

৪। ল্যাটিফান্ডিয়া কাকে বলে ?

৫। ইউনুসের নেতৃত্বে দাস-বিদ্রোহ সম্বন্ধে কি জান ?

৬। অগাষ্টাসের শাসন কিরূপ ছিল ?

৭। খ্রীষ্টধর্মের মূলকথা কি ?

(গ) এক কথায় উত্তর দাও :

১। কে রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন ?

২। কার্থেজের পক্ষে কে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ পরিচালনা করেন ?

৩। হ্যানিবল সিপিওর কাছে কোন্ যুদ্ধে পরাজিত হন ?

৪। রোমের শেষ সম্রাটের নাম কি ?

৫। যীশুর ধর্ম কোথায় প্রথমে প্রচার হয় ?

৬। কোন্ রোমান সম্রাট খ্রীষ্টধর্মকে প্রথমে আইনসঙ্গত ধর্ম বলে ঘোষণা করেন ?

৭। কোন্ রোমান সম্রাট খ্রীষ্টধর্মকে একমাত্র আইনসম্মত ধর্ম বলে ঘোষণা করেন ?

চীন

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। কনফুসিয়াসের জীবনী বর্ণনা কর।

২। কনফুসিয়াসের উপদেশগুলি বর্ণনা কর।

৩। সম্রাট সি-হুং-তি সম্বন্ধে কি জান ?

(খ) অল্প কথায় উত্তর দাও :

১। হ্যাং বংশের সম্রাট য়ু-ই সম্বন্ধে কি জান ?

২। হ্যাং বংশের শেষ রাজার সম্বন্ধে কি জান ?

৩। চীনের প্রাচীর সম্বন্ধে কি জান ?

(গ) এক কথায় উত্তর দাও :

১। কে চীনের সমস্ত ইতিহাস পুস্তকগুলি পুড়িয়ে ফেলেন ?

২। কে নিজেকে চীনের প্রথম সম্রাট বলে ঘোষণা করেন ?

ভারত

(ক) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। আর্যদের ভারতে আগমন সম্বন্ধে কি জান ? তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ সম্বন্ধে কি জান ?

২। বৈদিক যুগের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে কি জান ?

৩। মহাবীরের জীবনী ও শিক্ষার বিবরণ দাও।

৪। বৌদ্ধধর্মের মূল কথাগুলি আলোচনা কর।

৫। মৌর্য সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৬। কণিষ্ক কোন্ বংশের সম্রাট ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৭। সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্বের বিবরণ দাও।

৮। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্বন্ধে কি জানা যায়?

৯। মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার সম্বন্ধে কি জান?

১০। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে কি জান?

১১। মৌর্য ও কুষাণ যুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের বিবরণ দাও।

১২। মেগাস্থিনিস কে ছিলেন? তিনি ভারত সম্বন্ধে কি বিবরণ রেখে গেছেন?

১৩। ফা-হিয়েন কার রাজত্বকালে ভারতে আসেন? ভারত সম্বন্ধে তিনি কি লিখে গেছেন?

১৪। মৌর্যযুগ হতে গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতের শিল্প ও স্থাপত্যের বিবরণ দাও।

১৫। গুপ্তযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে কি জান?

১৬। তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কি জান?

১৭। গুপ্তযুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে কি জান?

(খ) অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। সিন্ধু-সভ্যতার পর ভারতে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তার নাম কি? কারা ঐ সভ্যতা গড়ে তোলে?

২। বৈদিক যুগে রাজনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল?

৩। মহাভারত ও রামায়ণ কে রচনা করেন? এই দুই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু কি?

৪। রামায়ণ ও মহাভারতে ভারতের সমাজ সম্বন্ধে কি জানা যায়?

৫। গৌতম বুদ্ধ কি ভাবে বোধি বা পরম জ্ঞান লাভ করেন?

৬। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যজয় সম্বন্ধে কি জান?

৭। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কি জান?

(গ) এক কথায় উত্তর দাও:

১। কাদের নাম অনুসারে হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত আর্যাবর্ত নামে পরিচিত হয়?

২। প্রাচীন আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?

৩। বেদ বুঝতে হলে যে ছয়টি বিষয় প্রথমে শিখতে হয়, তাদের এক কথায় কি বলে ?

৪। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্করের নাম কি ?

৫। বুদ্ধ কোথায় প্রথমে উপদেশ দান করেন ?

৬। কাকে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধের সিংহাসন অধিকার করেন ?

৭। পুণ্ড্রক বাসুদেব কার হাতে নিহত হন ?

৮। সমুদ্রগুপ্ত পুষ্করণের কোন্ রাজাকে পরাজিত করেন ?

৯। কোন্ যুগে গান্ধার শিল্পরীতির প্রবর্তন হয় ?

১০। 'বুদ্ধচরিত' কে রচনা করেন ?

১১। দশকুমার-চরিতের রচয়িতা কে ?

১২। পৃথিবীর আহ্নিক গতি কে আবিষ্কার করেন ?

১৩। চরক কার রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন ?
